দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ২৩ মার্চ, ২০২৬।। ৮ চৈত্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৩ মার্চ - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

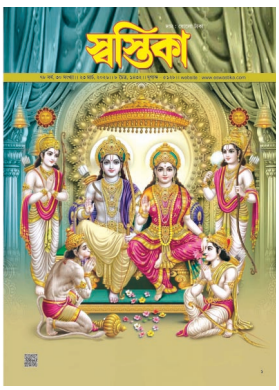

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশের শ্মশানযাত্রার ভয়ে সিঁটিয়ে শাসক— 'ভালো বাঙ্গালি খারাপ বাঙ্গালি'
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্রিগেডে ভারতীয় জনতা পার্টির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' □ ৭

আন্তর্জাতিক সংঘাতের আবহে ভারতে সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ রোধ জরুরি □ ডাঃ মধুসূদন পাল □ ৮

ছাবিশের নির্বাচন—পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির এক নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণ—পুনর্জাগরণ কিংবা ধ্বংসাবশেষ
□ সোমনাথ গোস্বামী □ ১১

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত
□ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৩

নির্বাচনে নাগরিক কর্তব্যের প্রতিফলন কর্তব্য
□ রামব্রহ্ম দেবশর্মা □ ১৫

শ্রীরামচন্দ্র একসূত্রে বেঁধেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষকে
□ গোপাল চক্রবর্তী □ ১৭

শ্রীরাম এক জীবনবোধ—ভারতের বিশ্বজনীন ইতিহাস
□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ২৩

ভারতীয় নারীর আদর্শ—জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী দময়ন্তী
□ সুতপা বসাক ভড় □ ৩১

মানবোন্নতির পথে— 'আমিত্ব'-বোধই সমস্ত বন্ধনের শৃঙ্খল
□ অনামিক রায় □ ৩৩

ভারতাত্মা মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র
□ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় □ ৩৫

সত্য ও ধর্মস্থাপনের উৎসব শ্রীরামনবমী
□ সরোজ চক্রবর্তী □ ৩৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশভক্তি ও দেশভাবনা
□ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় □ ৪৩

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা □ অবনীভূষণ মণ্ডল □ ৪৬

শুধু খিদিরপুর নয়, বালিগঞ্জও : কলকাতার 'মিনি পাকিস্তান' হয়ে ওঠা এক প্রবল অশনিসংকেত □ কৌটিল্য □ ৪৮

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার খেলায় বলি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ
□ বিপ্লব বিকাশ □ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ সংকলক— বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ৩০ মার্চ ২০২৬

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৩০ মার্চ ২০২৬

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। জ্বলছে তৈলকূপ, প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার। চলছে আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ। একদিকে আমেরিকা-ইজরায়েল অপরদিকে ইরান। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই মুহূর্তে এই যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। এরই সঙ্গে আরও দুটি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। রাশিয়া বনাম ইউক্রেন এবং আফগানিস্তান বনাম পাকিস্তান।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে চলেছে পরিস্থিতি?

এরকম অনেক বিষয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রামরাজ্য

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমাজজীবনে এক অমোচ্য স্বাক্ষর রাখিয়া যায়। ভারত ইতিহাসে শ্রীরাম তথা তাঁহার জীবনকথা 'রামায়ণ' বহু শতাব্দীর পরও ভারতবাসীর হৃদয়কে সমানভাবে ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। কাল তাহাকে এতটুকুও ম্লান করিতে পারে নাই। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম চরণ অতিক্রান্ত, মানব সমাজ আধুনিকতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তথাপি শ্রীরাম ও রামায়ণের প্রতি মানুষের ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আসলে রামায়ণ ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাস, যে ইতিহাস ভারতবাসীকে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণ বুঝিতে পারা যায়। ভারতবাসীর হৃদয় হইতে এই গৌরবের স্থানটিকে উৎপাটিত করিবার জন্যই বৈদেশিক আক্রমণকারীরা শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির বিধ্বংস করিয়া ভারতবাসীর ললাটে কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কন করিয়াছিল। সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ভারতবাসী পাঁচশত বৎসর অবিরাম সংঘর্ষ করিয়াছে। অবশেষে অযোধ্যায় ভব্য শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মিত হইয়া রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীন ভারতেও শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আইনি লড়াই করিতে হইয়াছে দেশবাসীকে। স্বাধীন ভারতের প্রারম্ভিক পর্বের শাসকবর্গ শ্রীরামমন্দির পুনরুদ্ধারে কোনোপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন নাই। বরং প্রতি পদে তাহারা সেই আক্রমণকারীদের ন্যায় বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহারা আদালতে হলফনামা পেশ করিয়া শ্রীরামের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণ করিবার অপপ্রয়াস করিয়াছেন। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, ভারত-সংস্কৃতি বিরোধীদের সেই অপচেষ্টা আদালতের সম্মুখে টিকিতে পারে নাই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নথিপত্র, ভূতত্ত্ববিদগণের তত্ত্বাবধানে খননকার্য, অযোধ্যা হইতে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত শ্রীরামের যাত্রাপথের প্রমাণ সংবলিত ঐতিহাসিক দস্তাবেজ শ্রীরামের ঐতিহাসিক সত্যতাকেই সিদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক গবেষকগণ শ্রীরামের আবির্ভাব সাত সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিলেও ভারতীয় কালগণনা অনুসারে তাঁহার আবির্ভাব ত্রেতাযুগে, যাহা কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে। দুঃখের বিষয় যে, পাশ্চাত্য মানসিকতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই সময়াবধিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। ভগবান শ্রীরাম সেই ত্রেতাযুগে শুক্লা চৈত্র নবমীতিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণ-সহ সমস্ত গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীরাম তথা রামায়ণের প্রভাব শুধু ভারতবর্ষেই নহে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইন্দোনেশিয়া, বালি, কম্বোডিয়া-সহ পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। সুদূর জাপানেও রহিয়াছে। জার্মানিতেও রহিয়াছে। সেখানকার অযোধ্যা ও রাম নামাঙ্কিত শহরগুলি তাহার প্রমাণ বহন করিতেছে। রামায়ণকে তাহারা তাহাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করিয়া থাকে। ইহার বিপ্রতীপে, ভারতের কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, ভোটভিখারি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী শ্রীরামনাম শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামনবমী উৎসব উদ্‌যাপনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। ইতিহাস সাক্ষী, অতি প্রাচীনকালে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, কংস প্রভৃতি অসুর ও দুরাচারীগণ বিষ্ণু নাম এবং দশানন রাবণ শ্রীরামনাম সহ্য করিতে পারিত না। লঙ্কাধিপতি রাবণ জীবনভর শ্রীরামের সহিত বৈরীভাব পোষণ করিয়াছে। পরিণামে তাহারা সকলেই ভগবান বিষ্ণু তথা শ্রীরামের হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসী শ্রীরামকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, পূজা করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ শাসনব্যবস্থাকে 'রামরাজ্য' বলিয়াছে। আদিকবি বাল্মীকি শ্রীরামের চরিত্র বর্ণনে সেই ভাব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কাহিনী কাব্যগ্রন্থের একত্রিশতম কবিতাতে 'ভাষা ও ছন্দ'-এ আদিকবির সেই ভাবটি বাংলাভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি রামায়ণকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উপাদান এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বাধীনতার পূর্বে বেশ কয়েকজন জাতীয় নেতা রামরাজ্যের ন্যায় একটি আদর্শ ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছিলেন। যেখানে সমাজের অন্তিম পঙ্‌ক্তির অন্তিম ব্যক্তিটিরও ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হইবে। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোনো দুর্নীতি থাকিবে না। অপরাধ সংঘটিত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার পর দেশের জাতীয় নেতৃত্ব এই প্রকারের কোনোরূপ চিন্তাভাবনাই করিতে পারেন নাই। তাহাদের কোনো সদিচ্ছাও ছিল না। স্বাধীনতার ষাট দশক পর দেশবাসী অনুভব করিতে পারিল যে, দেশ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছে। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে ভব্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। ইহা শুধু ভারতের নহে, বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

সুভাষিতম্

বিজেতব্যা লঙ্কা চরণতরণীয়ো জলনিধি
বিপক্ষঃ পৌলস্তো রণভূবি সহায়শ্চ কপয়ঃ।
তথাপ্যেকো রামঃ সকলমবধীদ্ রাক্ষসকুলম্
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।।

লঙ্কা জয় করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে পদব্রজে সমুদ্র পার হয়ে বানরসেনার সহায়তায় রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করতে হয়েছিল। মহান ব্যক্তিরা সংকল্প বলেই কার্যসিদ্ধি করেন, উপকরণের দ্বারা নয়।

বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশের শ্মশানযাত্রার ভয়ে সিঁটিয়ে শাসক

‘ভালো বাঙ্গালি খারাপ বাঙ্গালি’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তৃণমূলনেত্রী তার জাতীয় দলের তকমা বাঁচাতে পারেননি। টেলিফোনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চারবার অনুরোধ করে লাভ হয়নি। আম-ছালা দুটোই গেছে। তাই রাষ্ট্রপতিকেও অপমান করছেন। ‘অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে’। শুভেন্দু অধিকারী প্রমাণ করেছেন যে, ‘বাংলার মেয়ে’কে চায় না পশ্চিমবঙ্গ। সেই না চাওয়া আরও বেড়েছে। বহু ধরনের কুকীর্তিতে জড়িয়ে নেত্রী পশ্চিমবঙ্গকে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন। গত ১৫ মার্চ রাজ্য বিধানসভা ভোটের সময় ও দফা জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু’দফায় হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। এবারের ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রধান হাতিয়ার বেআইনি অনুপ্রবেশ। রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তার বিস্তারিত জানা যাবে। যদিও নির্বাচন কমিশন দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছে যে, ভোটাধিকার নিয়েই তাদের কাজ, অনুপ্রবেশ নয়। এই প্রতিবেদকের কাছে অনুপ্রবেশের সাপ্লাই লাইন কাটা হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাতে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গে এ মুহূর্তে তা অসম্ভব। কারণ অনুপ্রবেশ এ রাজ্যের শাসক দলের মদতে চলে।

পদের মোহে অনেকেই মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধী থেকে জ্যোতি বসু । আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫ বছরের মাথায় তৃণমূল তার জাতীয় দলের তকমা খোয়ালেও নেত্রী তাতে লজ্জিত নন। অবৈধ ভোটাধিকার বাঁচানোর নাটক চালাতে মুখ্যমন্ত্রী ধরনা মঞ্চ খাটিয়েছেন। মঞ্চ খাটিয়ে ধরনা কংগ্রেস দলের সংস্কৃতি। একসময় বলা হতো শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র ধর্মঘট। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ধরনা। সে ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। তবু কেন ব্যবহার হচ্ছে এই ভোঁতা আর বাতিল হওয়া অস্ত্র? ভোট বাক্স ভর্তি করার লক্ষ্য নিয়ে অনেকটা তড়িঘড়ি যুবসাথীর ভাতা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে খরচ পড়বে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা। রাজ্যের মোট দেনা ৮ লক্ষ কোটির বেশি। ২০২১-এ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে চমক ছিল যুবসাথীর ভাতা গ্রাহকদের মধ্যে সে আগ্রহ নেই। অনেকটাই ভাটা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুঝে ফেলেছেন তাঁর ভাতার চমক খাটছে না।

২০২১-এ এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ভোট পায়। যা বিজেপির থেকে প্রায় ৪১ লক্ষ বেশি। এসআইআর-এর ধাক্কায় প্রায় ১ কোটি ভুয়ো ভোটার বাদ হয়ে গেলে তৃণমূলের পপাতধরণীতল হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। যদি ধরে নিই যে, তৃণমূলের ভোট ব্যাংক অটুট রয়েছে, তাহলে যুবসাথী প্রকল্পে ভাতা পাওয়ার জন্য এ পর্যন্ত দাবিদারের সংখ্যা মাত্র ৮৪ লক্ষ হলো কেন? বোঝা যাচ্ছে তাদের ভোটব্যাংকে ক্ষয় ধরেছে। প্রধানভাবে যুবক-যুবতী ভোটারদের মধ্যে। পিস-মিল বা ধন্মের ঠক ভাতা দিয়ে তাদের ভোলানো যাবে না। রাজ্যের মহিলা ভোটের একাংশ-সহ মুসলমান আর লুম্পেন ভোটার নিয়ে তৃণমূল ২০২১-এর লড়াই জিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দল ভাঙানোর রাজনীতিতে আস্থা রাখাটা একটা রাজনৈতিক ভুল। অতীতের বিভ্রান্তি থেকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন। তবে পাঁচটি জেলার ১০০টি আসনে প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েও প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট ধরে রাখে ভারতীয় জনতা পার্টি। স্বাভাবিকভাবে ২০২৬ সালে সে জনসমর্থন আরও অনেকটাই বাড়বে। তবে শাসকবিরোধী ভোটের মাত্রা বেড়ে ঠিক কোথায় দাঁড়াতে পারে তা আন্দাজ করা শক্ত। তাতে বহু আসনে ভোট শতাংশে তৃণমূল তিনে নামলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এবারের ভোটে তৃণমূলের সবচাইতে বড়ো শত্রু মুসলমান ভোট। কিছু মুসলমান রয়েছেন যারা এখনও তৃণমূলকে তাদের ভোটদানের উপযুক্ত দল বলেই মনে করেন। অপৌত্তলিক হয়েও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিতে তারা পিছপা হন না। বিদেশি আদর্শের লেজুড়বৃত্তি করা সিপিএম তাদের দেশ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে সবসময় মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। তারা ও কিছু তথাকথিত মুসলমান বুদ্ধিজীবী এদেশ ও রাজ্যের সাধারণ মুসলমান ভোটারকে চরম অপমান করে কেবল ভোটের বোড়ে হিসেবে তাদের ব্যবহার করেছে। সেই ফাঁদে পা দিয়েছে সুবিধাবাদী চরিত্রের কিছু তথাকথিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী। তাদের কেউ একজন বিজেপিতে এসেছিলেন। নতুন ভিক্ষার আশায় তারা তৃণমূলে লাইন দিয়েছেন।

সওদাগরি ব্যবসা থেকেই বাঙ্গালির উত্থান। তাই হয়তো তৃণমূলের দোকান চালাতে সদা ব্যস্ত এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল। মাহমুদ মামদানি তাঁর ‘ভালো মুসলমান, মন্দ মুসলমান’ (অনুবাদ ঃ সাংবাদিক রজত রায়) বইয়ে দেখিয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায় আর সন্ত্রাসবাদ ঘিরে বৈপরীত্যের খেলা। একে অন্যের পরিপূরক নয়। তৃণমূলের বিদায় সুনিশ্চিত হলে লেখা যেতে পারে ‘ভালো বাঙ্গালি, খারাপ বাঙ্গালি’। তাতে বুঝিয়ে সম্ভব হবে যে, বাঙ্গালি পরিবর্তন করতে জানে । আর করেও। জানি না সে আশা পূর্ণ হবে কি না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্রিগেডে ভারতীয় জনতা পার্টির ‘পরিবর্তন সংকল্প সভা’

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৫ বছর ধরে চরম অরাজকতা কায়েম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। সেই নৈরাজ্য অবসানের লক্ষ্যে গত ১ মার্চ কোচবিহার থেকে ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’র সূত্রপাত করেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন। উত্তরবঙ্গে এই কার্যক্রমের পরের দিন, ২ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘিতে এই যাত্রার সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন ছিল বিজেপি-র প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক বক্তব্যের মূল ইস্যু। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা হতে রাজ্যবাসীর বঞ্চিত থাকা, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা-সহ নানা বিষয় উঠে আসে বিজেপি-র পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে রাজ্যের ক্ষমতাকেন্দ্রে আশু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে রাজ্যজুড়ে প্রচারাভিযান করে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই যাত্রায় অংশগ্রহণকারী যানবাহন ও কার্যকর্তাদের ওপর বিভিন্ন জেলায় নেমে আসে প্রবল আক্রমণ। রাজ্যের শাসক দলের আশ্রিত সমাজবিরোধী ও জেহাদিদের হামলায় বিজেপি-র কার্যকর্তা ও সমর্থকরা আহত ও রক্তাক্ত হন।

রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র পরিক্রমা করে গত ১৪ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শেষ হয় পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা। ব্রিগেড ময়দানে এদিন আয়োজিত হয় এক বিরাট জনসভা। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এদিন এক অভূতপূর্ব জনপ্লাবনের সাক্ষী থাকে কলকাতা মহানগর। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, ড. সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, জনপ্রিয় অভিনেতা গৌরাঙ্গ (মিঠুন) চক্রবর্তী, সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, রাজু বিস্তা, জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো, রাহুল সিন্‌হা, সৌমিত্র খাঁ, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক প্রমুখ বিশিষ্ট কার্যকর্তা ও জনপ্রতিনিধি। সমগ্র সভাটি এদিন পরিচালনা করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবজিৎ সরকার। বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের পর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্টজন এদিন জনসভায় যোগ দেন। এদিন সভাস্থলে আসার পথে মধ্য কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ‘গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশন’ সংলগ্ন এলাকায় রাজ্যের শাসক দলের হার্মাদ বাহিনীর হামলার শিকার হয় দু’টি বাস। বাসযাত্রীদের লক্ষ্য করে ইট ও পাথরবৃষ্টি শুরু হতেই তৃণমূলি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বাসযাত্রীদের একাংশ। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা চত্বর। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূলি সমাজ - বিরোধীদের উসকানি দিতে শুরু করেন। তৃণমূলি গুন্ডা ও জেহাদিরা বাস দু’টিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। বাসযাত্রীদের রক্ষা করতে গিয়ে জেহাদিজের দ্বারা প্রহৃত হন বিজেপি-র উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। তৃণমূলি গুন্ডা ও উন্মত্ত জেহাদিদের দাপাদাপি চলায় গণ্ডগোল থামাতে প্রথমদিকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ছিল কলকাতা পুলিশ। জেহাদি তাণ্ডবের সামনে তারা কার্যত ছিল দর্শকের ভূমিকায়। পরে গণ্ডগোল ব্যাপক আকার ধারণ করলে শাসক দলের নির্দেশে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আঘাতহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত উসকানি দিতে থাকা দাঁড়িয়ে থাকা শশী পাঁজার ভিডিয়ো ভাইরাল হলেও পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হলে তাকে ব্যান্ড-এইড পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়াও এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় সভাস্থলে আসা পাঁচটি বাসকে আটকে ভাঙচুর করে তৃণমূলি গুন্ডাবাহিনী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন ব্রিগেডে আসার পথে আহত ও রক্তাক্ত হন বিজেপি কর্মী-সমর্থক-সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন গেট দিয়ে যাতে মানুষ সহজে ব্রিগেডে প্রবেশ করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে একাধিক রাস্তা এদিন বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুলিশ। প্রেস গেট দিয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশেও বাধা দেয় পুলিশ। এতদ্‌সত্ত্বেও এদিন কলকাতায় ১০ লক্ষাধিক মানুষের বিপুল জনসমাগম ঘটে। রাজ্যে পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এদিনের সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। □

আন্তর্জাতিক সংঘাতের আবহে ভারতে সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ রোধ জরুরি

ভারতবিরোধী বিদেশি শক্তিগুলোর মদতপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দলের একটা বড়ো অংশ বর্তমানে রাজ্যে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা শুধু হিন্দুদের অস্তিত্বের সংকট নয়, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তৈরি করেছে সুগভীর সংকট।

ডাঃ মধুসূদন পাল

সবদেশের মানুষের আশঙ্কা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি হবে? কারণ অনেক দেশের হাতেই এখন পারমাণবিক, হাইড্রোজেন এবং আন্তঃউপমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্থাৎ আকাশ-মহাকাশ যুদ্ধের সরঞ্জাম। বিবেকহীন যুদ্ধবাজদের হাতে এই অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ এলে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ইউরোপের একটি স্থানীয় আন্তর্জাতিক সংঘাত থেকে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এরকম একাধিক আন্তর্জাতিক সংঘাত রয়েছে। যেমন, ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান তৈরির পর থেকেই কাশ্মীর সীমান্তে ভারত-পাক যুদ্ধ বা সংঘাত চলেছে একাদিক্রমে আট দশক ধরে। ১৯৪৮-এ ইজরায়েল তৈরির পরে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ চলছে একাদিক্রমে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট চীন জন্মের পরে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন চলছে প্রতিনিয়ত। সেই সঙ্গে 'দক্ষিণ চীন সাগরে' চীনের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভিয়েতনাম-আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হলেও তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকার অবস্থানের কারণ হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থের জন্য আগ্রাসী চীনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান এখানে আমেরিকার সঙ্গী। তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন নীতি এবং উত্তর কোরিয়ার জঙ্গি সরকারের সমরনীতি যেকোনো সময়ে বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। কাশ্মীর এবং আরব-ইজরায়েল নিয়েও এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে দিয়ে ইউক্রেনের মাথায় আমেরিকা একটা স্বপ্ন ঢুকিয়েছে যে, ইউক্রেন ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত হলে ইউক্রেনবাসী পশ্চিম ইউরোপের উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ পাবে। বিভিন্ন সময়ে রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে ন্যাটো। আমেরিকান ডিপ-স্টেট ইউক্রেনে রাশিয়া অনুরাগী প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নাটুকে-ক্লাউন জেলেনস্কিকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে।

অন্যদিকে রাশিয়ার ঘোষিত বক্তব্য, তাদের দোরগোড়ায় ন্যাটোর বিস্তার রাশিয়ার আত্মরক্ষার পথে বাধা। এটা তারা কখনোই বরদাস্ত করবে না। অনেক সতর্কীকরণের পরেও ইউক্রেন কথা না শোনায় রাশিয়া তিন বছর আগেই আক্রমণ করেছে ইউক্রেনকে। রুশ ভাষাভাষী অঞ্চল এবং কিছু শিল্প ও খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলকে দখলে নিয়েছে রাশিয়া; যার পরিমাণ—ইউক্রেনের ১৮ শতাংশ। ইউএসএ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ইউক্রেনকে প্রভূত সাহায্য করেও রাশিয়ার অগ্রগতি থামাতে ব্যর্থ। যদিও রাশিয়ার আর্থিক সামরিক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। এই অবস্থায় বাধ্য হয়েই চীন ও উত্তর কোরিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়েছে রাশিয়া। এদিকে আমেরিকা অবরুদ্ধ করে রেখেছে রাশিয়ার বিশ্ববাণিজ্য। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমেরিকা পৃথিবীর সব দেশকে ভয় দেখিয়েছে এই বলে, যে বা যারা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করবে তাদের বিরুদ্ধে তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভয় দেখানো সত্ত্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম নিতে বাধ্য। কারণ, তারা রাশিয়ার উপর দীর্ঘদিন নির্ভরশীল। দূরদেশ আমেরিকা বা আরব দেশগুলির থেকে তেল কিংবা গ্যাস আনা অনেক খরচ ও সময়সাপেক্ষ। ভারত ও চীন এই সুযোগে স্বল্পমূল্যে রাশিয়ার পেট্রোলিয়াম ক্রয় করছে সরাসরি, ডলারের আধিপত্যের বাইরে গিয়ে। এতে আমেরিকার দম্ভে আঘাত লেগেছে। চীন ও ভারত থেকে যেসব দ্রব্য আমেরিকার বাজারে যায়, তার উপর ডোনাল্ড ট্রাম্প অতিরিক্ত প্রায় ৫০ শতাংশ কর মাশুল বসিয়েছে। ১০০ শতাংশ মাশুল বসানোর ভয় দেখিয়ে রেখেছিল। সম্প্রতি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই শুল্ক কমে যেতে পারে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চায়, পুতিনকে চাপ দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে। ইউক্রেন যুদ্ধ থামলেই ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামানোর নৈতিক সাফল্যের বিনিময়ে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার দাবি করবে। ট্রাম্পের বড়ো লোভ, শান্তিতে নোবেল প্রাইজ লাভ। আমেরিকা এই মুহূর্তে সরকারিভাবে সব থেকে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ। ওই দেশের নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে ধনী হলেও দেশটা ঋণজর্জর। আমেরিকা এমন একটা দেশ, যার গভীরে

রয়েছে Global Deep State, যার মালিক ওই দেশের সামরিক অস্ত্র তৈরি ও বিক্রির ব্যবসায়ীরা। কারণ, সামরিক অস্ত্র তৈরি ও বিক্রিতে সবচেয়ে বেশি মুনাফা। অন্যদিকে খাদ্য দ্রব্য, ওষুধ আর প্রসাধনী দ্রব্য তৈরি ও বিক্রির মুনাফা তুলনামূলকভাবে কম। এগুলো এখন তৈরি করে ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ। কারণ এসব দেশে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায়। এখান থেকে আমেরিকা এগুলো আমদানি করে দেশের নাগরিকদের জন্য। সমগ্র পৃথিবীতে অস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য তাদের গোয়েন্দা সংস্থা CIA নোংরাভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে চলেছে ন্যক্কারজনকে ভাবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ হলেই অস্ত্রের চাহিদা বাড়বে। একপক্ষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'পক্ষই অস্ত্র কেনে আমেরিকার কাছ থেকে। হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্টরা অনেকক্ষেত্রেই দেশের আইনগত বা বিবেকমতো কাজ করতে পারে না। আমেরিকার Deep State-এর স্বার্থের বাইরে গেলে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জীবনের পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। উদাহরণ, প্রেসিডেন্ট কেনেডি ভিয়েতনাম যুদ্ধ থামানোর জন্য অগ্রণী হলে CIA-এর চক্রান্তে অর্থাৎ Deep State-এর স্বার্থে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে প্রাণ দিতে হয় গুলিবিদ্ধ হয়ে।

এই মুহূর্তে USA একটি মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। এদের মূল উদ্দেশ্য, সামরিক অস্ত্র তৈরি ও বিশ্বের বাজারে বিক্রি। অন্যদিকে, বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তন ও যুদ্ধ লাগানোর পরিস্থিতি তৈরির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের সামরিক বাহিনীকে রাখতে হয়েছে। এই বাবদে খরচ করতে হচ্ছে প্রভূত অর্থ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করছে সেই দেশ— আমেরিকার জনগণ নয়। আগেই বলেছি, দাদাগিরি করতে গিয়ে আমেরিকা এই মুহূর্তে হিসেবে সবথেকে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ। দেশের মধ্যে কর বাড়িয়ে টাকা তুলতে গেলে জনগণ ক্ষুব্ধ হবে— হচ্ছেও তাই। চীন ও ভারতে তৈরি দ্রব্যের উপর আমদানি কর/মাশুল আমেরিকা বাড়িয়েছিল অনেক বেশি। ফলে আমেরিকাতে আমদানি করা ওষুধ ও প্রসাধনী দ্রব্যের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্কিন জনগণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। যার ফল, ট্রাম্পের নিজের শহর নিউ ইয়র্কে মেয়র পদে ভোটে তাঁর দলের হার হয়েছে লজ্জাজনকভাবে। তাই ট্রাম্প চিন্তা করছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কবজা করে সে দেশের পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিশ্ববাজারে বিক্রয় করে নিজ ক্ষতি বা ঋণ সামলানোর।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একাংশে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। অনুপ্রবেশের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারীরা রেশন কার্ড, আধার-প্যান-ভোটার ইত্যাদি সব কার্ড পেয়ে যাচ্ছে। এমনকী পাচ্ছে সরকারি 'ডোল'। দোষী করা হচ্ছে ভারত সরকারকে— কারণ বর্ডার সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল জমি না দেওয়ার ফলে যে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না সেটাই আড়ালে থেকে যাচ্ছে।

আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদের উপর চীনের মতো লোভ আছে আমেরিকারও। এক সময় আমেরিকা ইরাকের সাদ্দামকে তোল্লা দিয়েছিল ইরানের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য, আরব ভূখণ্ডে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তার। ইজরায়েলকে একাদিক্রমে আমেরিকার সমর্থন দানের প্রধান কারণ তার তেল রাজনীতি বা অয়েল ডিপ্লোম্যাসি। আমেরিকার এই তেল রাজনীতির বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে, ইজরায়েলকে মাধ্যম করে আমেরিকা তাদের আক্রমণ করবে। পাকিস্তানের সামরিক জেনারেল ও একনায়কদের নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে চলেছে আমেরিকা। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানে যে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে, সেখান থেকে তার তেল রাজনীতির স্বার্থবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার অবস্থানের উদ্দেশ্য এটাই। নির্লজ্জভাবে USA এখন তার পুরানো মনরো-ডকট্রিন কার্যকর করেছে। মূল উদ্দেশ্য, সমগ্র উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাকে নিজের জমিদারি হিসেবে ব্যবহার করা। কানাডাকে আমেরিকা নিজের দেশ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্বাধীন দেশের উপর আমেরিকা হস্তক্ষেপ করছে।

উত্তর আমেরিকার অংশ গ্রিনল্যান্ড দখলেও মরিয়া হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ আমেরিকাতে ভেনেজুয়েলার মতো কিছু তেল সমৃদ্ধ দেশ আছে। অনেক দেশ অমেরিকাকে মানছে না। তাই নির্লজ্জভাবে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন অবজ্ঞা করে মধ্যরাত্রে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তার পত্নীকে নাটকীয়ভাবে সামরিক অভিযান চালিয়ে অপহরণ করে এনেছে। এটাকেই এখন বলা হচ্ছে Donro Doctrine অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বারা সংস্কার করাই হলো

ডনরোডকট্রিন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকার জনগণকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন--- MAGA=Make America Great Again। এই স্বপ্নে বিভোর ছিল আমেরিকার জনগণ। যারা কখনো Republican প্রার্থীদের ভোট দেয়নি তারাও, যথা--- ভারত থেকে যাওয়া হিন্দুরা, এশিয়া-আফ্রিকা থেকে যাওয়া মানুষদের অনেকেই এবার ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিল। ভারত থেকে যাওয়া হিন্দুরা এখন নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছে। পৃথিবীর কাছে আমেরিকার ডিপ স্টেটের ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী রূপটা ভীষণভাবে নগ্ন হয়ে গেছে। ট্রাম্প এইসব করতে গিয়ে যেমন সমগ্র বিশ্বকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন তেমনি আমেরিকাকেও বিপদে ফেলেছেন।

কারণ, আমেরিকাকে এখন অন্যকোনো দেশ বিশ্বাস করতে চাইছে না। যে পশ্চিম ইউরোপ ছিল আমেরিকার সবসময়ের বন্ধু, সমস্ত নোংরামির সমর্থক, তারাও আজ গ্রিনল্যান্ড বিষয়ে আমেরিকার পদক্ষেপে ভীষণ ক্ষুব্ধ। গ্রিনল্যান্ড একটি বিশাল স্বাধীন অঞ্চল। দেশটি গত ৮০০ বছর ধরে ডেনমার্কের অধীন। এর বরফের তলায় ঢাকা আছে প্রভূত সম্পদ। উত্তর মেরুর কাছে আলাস্কা অঞ্চল রাশিয়ার কাছ থেকে কিনে নিয়েছে আমেরিকা। এখানেও প্রভূত সম্পদ আছে বরফের তলায়। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো গ্রিনল্যান্ডে সেনা পাঠিয়েছে তাকে রক্ষার জন্য। এটা একটা অভূতপূর্ব এবং অকল্পনীয় অবস্থা। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় থেকেই ন্যাটোর ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত ছিল। সেটা আরও তীব্র হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সংঘাত অকল্পনীয়। এটাই হচ্ছে, দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

১৯৪৫ থেকে USSR ভেঙে পড়া পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে USSR-এর যে বিশ্বব্যাপী সংঘাত তা বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই ঠাণ্ডা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গোটা পৃথিবী প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিক USA গ্রুপ, অন্যদিকে USSR। এই সময় নিঃসন্দেহে সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে আমেরিকা প্রথম এবং চীন ছিল দ্বিতীয়। রাশিয়া ও ভারতের অবস্থান ছিল যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে। আমেরিকার ভয়, চীন তার ঘাড়ের উপর উঠে পড়বে। ইতিহাসের কী বিচিত্র খেলা! এই চীনকে শিল্প ও অর্থের দিক থেকে উন্নত করতে একসময় সাহায্য করেছে আমেরিকা। ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল ১৯৭১-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়। সেই সময় পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। পরোক্ষভাবে এটা ছিল কার্যত ভারত ও রাশিয়ার কাছে চীন ও আমেরিকার পরাজয়। ভারতকে দুর্বল করার জন্য আমেরিকা ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করতে শুরু করে চীনকে। তখন চীনে ছিল কোটি কোটি বেকার, পৃথিবীর সবথেকে সস্তা শ্রমিক। ওষুধ ও প্রসাধনী দ্রব্য তৈরির প্রযুক্তি ও অর্থ আমেরিকা বিনিয়োগ করেছিল চীনের মাটিতে। কোটি কোটি চীনা যুবক সুযোগ পেয়েছিল কাজ করার। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এইসব জিনিসের সবথেকে বড়ো উৎপাদনকারী দেশ হলো চীন। এদের উৎপাদিত দ্রব্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে খুব সস্তায় বিক্রি হয়। এখান থেকে চীন প্রভূত অর্থ আয় করে ব্যবহার করেছে অস্ত্র উৎপাদনে। আমেরিকার কাছে ব্যাপারটি খুবই উদ্বেগের।

বিশ্ব রাজনীতিতে কেউ চিরবন্ধু বা চিরশত্রু নয়। সবাই দেখে নিজ স্বার্থ। একজন ভালো দেশনায়ক নিজ দেশের স্বার্থ দেখতে গিয়ে অন্যদেশের ক্ষতি করে না। অন্যদিকে এরকম দেশ বা দেশনায়ক আছে, যারা অন্যের ক্ষতি করেও নিজ স্বার্থ অটুট রাখে। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম— সবই ছিল কমিউনিস্ট দেশ। তা সত্ত্বেও ১৯৬২-৬৪- তে চীনা বাহিনী ও রাশিয়ার লাল ফৌজ মঙ্গোলিয়াকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে চীন আক্রমণ করে ভিয়েতনামকে। এইসব কমিউনিস্ট দেশ নিজেদের সংঘাত বন্ধ করতে পারেনি। ইউরোপের সব দেশ আজ প্রায় ১৫০০ বছর ধরে খ্রিস্টান। অথচ সেখানে যুদ্ধ হয়েছে বহুবার। এমনকী প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তিও সেখানে। ইরান-ইরাক মুসলমান দেশ। তাদের মধ্যেও যুদ্ধ ছিল অব্যাহত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭১-এ যুদ্ধ হয়। পরিণতি সবার জানা।

চীন, পাকিস্তান, তুরস্কের সাহায্যে আমেরিকান ডিপ স্টেট বাংলাদেশে হাসিনা সরকারকে উৎখাত করে ইউনুসকে বসিয়ে ছিল ১৯৭১-এ তাদের পরাজয়ের বদলা নিতে। একই সঙ্গে তারা চাইছে ভারতকে দুর্বল করতে। তারা জানে, বাংলাদেশের আগুন পূর্ব ভারতকেও পোড়াবে। ভারতের উপর প্রচণ্ড রাগ আমেরিকার। কারণ, বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করেননি। ভারতের ভেতরে দাঙ্গা, ভাঙন লাগানোর জন্য গত ৩৪+১৫ অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে কয়েক কোটি মুসলমান ও রোহিঙ্গা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে যাদের একটা বড়ো অংশ সন্ত্রাসবাদী।

অনুপ্রবেশ অব্যাহত রাখতে প্রথম ৩৪ বছর সিপিএম, পরের ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেস সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ বা ভারত সরকারকে জায়গা দেয়নি। এই জায়গা টাকার বিনিময়ে কেনার জন্য BSF তথা কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে রাজ্য সরকারকে। অর্থাৎ এই কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। অনুপ্রবেশের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারীরা রেশন কার্ড, আধার-প্যান-ভোটার ইত্যাদি সব কার্ড পেয়ে যাচ্ছে। এমনকী পাচ্ছে সরকারি 'ডোল'। এখন টিএমসি দোষ দিচ্ছে ভারত সরকারকে— কারণ বর্ডার সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। ইউনুস বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানকে নরকে পরিণত করেছে। অথচ বাংলাদেশের সমস্ত অশান্তি ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের জন্য ইউনুস দোষ দিয়েছে ভারতকে। পশ্চিমবঙ্গের টিএমসি সরকার এবং বাংলাদেশের ইউনুস সরকার— দু'পক্ষই আমেরিকান ডিপ স্টেট ও প্যান ইসলামের গোপন আর্থিক সহায়তা পেয়েছে ভারতকে দুর্বল করার জন্য।

ভারতবিরোধী বিদেশি শক্তিগুলোর মদতপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দলের একটা বড়ো অংশ বর্তমানে রাজ্যে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা শুধু হিন্দুদের অস্তিত্বের সংকট নয়, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তৈরি করেছে সুগভীর সংকট। এখনই দরকার, কড়া হাতে ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। □

ছাব্বিশের নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির এক নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণ—পুনর্জাগরণ কিংবা ধ্বংসাবশেষ

সোমনাথ গোস্বামী

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ছিল এক অবিসংবাদিত শিল্প-অধীশ্বর এবং এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক হাব হিসেবে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ — এই প্রথম এক দশক ছিল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির প্রকৃত স্বর্ণযুগ, যা আজও আধুনিক প্রজন্মের কাছে এক অবিশ্বাস্য রূপকথা। সেই সময়ে ভারতের মোট শিল্প বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি এবং কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সিংহভাগ আসত একা এই রাজ্য থেকে। তখনকার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ছিল জাতীয় গড় আয়ের প্রায় ১০৫ শতাংশের বেশি। ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে জেসপ, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বা ব্রেথওয়েটের মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলি তখন এই রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করত। রাসায়নিক শিল্প, পাট ও বস্ত্রবয়ন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ তখন কেবল ভারতের নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবিসংবাদিত অধিনায়ক। শিল্পোন্নত আধুনিকতার সেই দাপট এমনই ছিল যে, তৎকালীন বোম্বে বা মাদ্রাজও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক গতির কাছে ম্লান হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মোট শিল্প কর্মসংস্থানের প্রায় ৩৩ শতাংশই ছিল এই রাজ্যে, যার ফলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা ওড়িশা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকার সন্ধানে এই রাজ্যে ভিড় জমাতেন। উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব, মাথাপিছু আয়ের উচ্চহার এবং একটি উদ্বৃত্ত রাজস্বের রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ তখন ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হতো। কলকাতা বন্দর তখন প্রাচ্যের অন্যতম ব্যস্ততম প্রবেশদ্বার, যেখান দিয়ে দেশের প্রায় ৪২ শতাংশ রপ্তানি-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এই সুবর্ণ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচুতে ছিল এবং রাজ্যটির রাজস্ব ঘাটতি ছিল সম্পূর্ণ শূন্য।

কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রগতির চাকায় প্রথম এবং সবথেকে বড়ো মরণকামড় বসাল তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তিত 'মালমাশুল সমীকরণ নীতি' বা Freight Equalization Policy (FEP)। ১৯৫২ সালে গৃহীত এই বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কয়লা ও আকরিক লোহা সারা দেশে একই দামে পাওয়া যেতে শুরু করল। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব রাতারাতি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। গাণিতিক ভাষায় এর অর্থ দাঁড়াল, আসানসোল বা দুর্গাপুরের কারখানায় যে দামে কয়লা পৌঁছাত, কেন্দ্রীয় ভরতুকির জাদুবলে সেই একই দামে কয়লা পৌঁছাতে শুরু করল আহমেদাবাদ, চেন্নাই বা পুনের কলকারখানায়। ট্র্যাজেডি হলো এই যে, নীতিটি ছিল সম্পূর্ণ একপাক্ষিক ও পক্ষপাতদুষ্ট; যদি খনিজের মতো পশ্চিম ভারতের তুলা, তৈলবীজ বা দক্ষিণ ভারতের রবার ও নারকেলজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও একই 'সমীকরণ নীতি' গ্রহণ করা হতো, তবে আজ পশ্চিমবঙ্গ কেবল ভারতের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। এই অশুভ নীতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-কফিনে প্রথম পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিল। পুঁজিপতিরা তখন কাঁচামালের উৎসের বদলে বাজারের নৈকট্য ও সস্তা মাশুলের সুবিধা দেখে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দিকে তাঁদের বিনিয়োগ সরিয়ে নিতে শুরু করেন। এর প্রভাবে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রবৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের নীচে নামতে শুরু করে এবং বিনিয়োগের অভিমুখ চিরতরে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র থেকে মুছে যেতে থাকে। কংগ্রেসের এই বঞ্চনা এরাজ্যের কয়েক প্রজন্মের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে দিল্লির দরবারে বন্ধক রেখে দিয়েছিল।

> **এরাজ্যের মানুষ যদি আবার শিল্পমুখী বিনিয়োগ, বৃহৎ পুঁজির আমন্ত্রণ এবং স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ বেছে নিতে না পারে, তবে ইতিহাসের পাতায় একদা-সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি কেবল একটি 'ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা'র জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবেই ধুলো মাখবে।**

ষাটের দশকের শেষভাগে এই শিল্প-অসন্তোষ এবং কংগ্রেসের নীতিগত বঞ্চনাকে রাজনৈতিক মূলধন করেই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের উত্থান ঘটে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতার মসনদে বসার পর তারা উন্নয়নের বদলে উগ্র 'শ্রেণীসংগ্রামের' ধুয়া তুলে ঘেরাও,

ফঃ ২

লাগাতার ধর্মঘট এবং বিধ্বংসী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিবেশকে পুরোপুরি বিষিয়ে তোলে। শিল্পের 'ঘেরাও' নীতি আদতে পুঁজিপতিদের পলায়নের জন্য এক মসৃণ রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিল। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন শিল্প ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি। এই দীর্ঘ স্থবিরতার ফলে ১৯৮০-৮১ সালে প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের নীচে নেমে আসে, যাকে অর্থনীতিবিদরা 'ডেথ ক্রস' (Death Cross) বলে অভিহিত করেন। যদিও অনেক পরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'তথৈবচ' মানসিকতা ছেড়ে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেনেসাঁ' বা শিল্পায়নের চাকা ঘোরানোর এক মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দলেরই এক বিশাল অংশের ক্যাডার ও নেতৃত্বের রক্ষণশীল এবং 'লেনিনবাদী' গোঁড়ামি সেই স্বপ্নকে সফল হতে দেয়নি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের জমানায় তাঁর নিজস্ব দল এবং ক্যাডার বাহিনীর এক বড়ো অংশই তাঁর 'ভিশন'-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। ফলস্বরূপ, টাটারা পশ্চিমবঙ্গের মাটি ছাড়তে বাধ্য হয় এবং রাজ্যের আধুনিক শিল্পায়নের শেষ আশাটুকুও রাজনৈতিক ক্যাডারদের পেশিশক্তির দাপটে নির্বাপিত হয়।

বামপন্থীদের পতনের পর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির চরিত্রে কোনো সদর্থক বা বৈপ্লবিক বদল আসেনি। বরং বামপন্থীদের একনিষ্ঠ ভোটব্যাংককে নিজের দিকে স্থায়ীভাবে টানতে তিনি নিজেকে 'আসল বামপন্থীদের চেয়েও বেশি চরমপন্থী' হিসেবে জাহির করার প্রতিযোগিতায় নামেন। ফলস্বরূপ, বৃহৎ পরিকাঠামো বা ভারী শিল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে তিনি শুরু করেন এক সর্বনাশা ও পরনির্ভরশীল 'ডোল পলিটিক্স' বা দাক্ষিণ্যের রাজনীতি। জনমোহিনী প্রকল্পের আড়ালে রাজ্যের সীমিত ও ঋণগ্রস্ত কোষাগারকে এমনভাবে ব্যবহার করা শুরু হলো, যা সুস্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টির বদলে কেবল সরকারের ওপর নির্ভরশীলতার এক বিকলাঙ্গ সংস্কৃতি তৈরি করল।

পরিসংখ্যান বলছে, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট ব্যয়ের একটি সিংহভাগ কেবল অনুদান-মেলা-খেলা ও ভরতুকিতেই নিঃশেষিত হয়েছে। যেখানে উন্নত রাজ্যগুলি তাদের বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ 'ক্যাপিটাল আউট্‌লে' বা সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যয় করে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে ২ শতাংশের গণ্ডিও পেরোতে হিমশিম খাচ্ছে। রাজ্যের এমএসএমই খাতের সংখ্যা কাগজে-কলমে বাড়লেও বৃহৎ শিল্পের অনুপস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকদের জন্য প্রকৃত উচ্চ-আয়ের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বা উন্নত 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' পরিবেশ তৈরির পরিবর্তে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা বিভিন্ন ক্লাবকে নগদ বণ্টনেই আটকে রইল রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা। এই মডেল দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বদলে কেবল ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক লাভ এবং একটি অনুগত ভোটব্যাংক নিশ্চিত করেছে, যার মূল্য দিচ্ছে এরাজ্যের বেকার শিক্ষিত যুবসমাজ।

জ্যোতি বসুর আমল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় –- পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শাসকই নিজেদের প্রশাসনিক ও নীতিগত ব্যর্থতা ঢাকতে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' বা central deprivation-এর ধুয়ো তোলাকে এক শিল্পে পরিণত করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোজনা কমিশন অবলুপ্ত করে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে রাজ্যের প্রাপ্য করের অংশ ৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের হাতে বিপুল অর্থ তুলে দিয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ আজ অতীতের তুলনায় অনেক বেশি স্বয়ংক্রিয় এবং নন-ডিসক্রিশনারি তহবিল পায়। তথ্য ও পরিসংখ্যানের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, ইউপিএ আমলের (২০০৪-১৪) তুলনায় এনডিএ জমানায় (২০১৪-২৪) পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৮.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তান্তর হিসেবে পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় প্রায় ২৫০ শতাংশেরও বেশি। অথচ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সেই বিশাল অর্থ এবং পূর্ব ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (ইডিএফসি)-র মতো আধুনিক রেল পরিকাঠামোর সুযোগ কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প করিডোর গড়ার পরিবর্তে রাজ্য সরকার সেই অর্থ জনমোহিনী প্রকল্পের মোড়কে ব্যয় করে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে সেটিকে নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। ফলাফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ ঋণগ্রস্ত রাজ্য হিসেবে কলঙ্কিত, যার মোট ঋণের পরিমাণ আজ ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ওড়িশার মতো প্রতিবেশী রাজ্য যেখানে ঋণের বোঝা কমিয়ে আজ 'রেভিনিউ সারপ্লাস' রাজ্যে পরিণত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে ঋণের সুদ মেটাতেই নতুন করে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ এক ঐতিহাসিক ও চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কেবল এক সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং এটি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অস্তিত্বের শেষ ফয়সালাকারী মুহূর্ত। রাজ্যটি কি আবার তার হারানো 'প্রিমিয়াম লিগ' মর্যাদা ফিরে পাবে, নাকি ঋণের মরণফাঁদে আটকে চিরতরে এক মৃত অর্থনীতি (Failed Economy)-তে পরিণত হবে; তার উত্তর লুকিয়ে আছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ওপর। একদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক 'বিকাশ' মডেল, যা ইডিএফসি, নতুন বিমানবন্দর ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের হারানো শিল্প-গৌরব পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারে; অন্যদিকে রয়েছে বর্তমানের সেই পুরনো 'খয়রাতি' মডেল, যা রাজ্যকে ক্রমাগত দেউলিয়া হওয়ার দিকে এবং শিক্ষিত মেধার পলায়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এরাজ্যের মানুষ যদি আবার শিল্পমুখী বিনিয়োগ, বৃহৎ পুঁজির আমন্ত্রণ এবং স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ বেছে নিতে না পারে, তবে ইতিহাসের পাতায় একদা-সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি কেবল একটি 'ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা'র জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবেই ধুলো মাখবে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, আর একটি ভুল আবেগের স্রোতে গা ভাসানো রাজ্যকে হয়তো এমন এক অন্ধকার গহ্বরে পাঠাবে যেখান থেকে ফেরার আর কোনো রাস্তা হয়তো পরবর্তী এক শতাব্দীতেও তৈরি হবে না। □

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেছে। রাজনৈতিক মহলে এখন একটি নতুন আলোচনা— এই নির্বাচনে নাকি হিন্দু ভোটই বিএনপিকে জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছে। অনেকের মনে তাই আশা জেগেছিল, হয়তো এবার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা কিছুটা হলেও কমবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হিন্দুদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতনের খবর সামনে আসছে, তা প্রমাণ করে দেশটির ভেতরে লুণ্ঠন ও দখলদারির যে প্রবণতা বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছে, তা এখন এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবরের ঘটনার পর সম্প্রতি কুমিল্লার একটি ঘটনা আবারও অতীতের বহু নিপীড়ন ও নির্যাতনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে। শহরের এক প্রাচীন ধর্মীয় স্থানে শনিপূজা চলাকালীন হঠাৎ পুরোহিতকে লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বিস্ফোরণে পুরোহিত গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তার আঘাত এতটাই গুরুতর যে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। কক্সবাজারে চাঁদার জন্য গণেশ পালকে কুপিয়ে হত্যা, বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে রাজভরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, বিয়ে বাড়িতে সাউন্ডবক্স বাজানোর কারণে হামলা, নওগাঁয়ের আতরাইয়ে স্ত্রী ও মেয়েকে হত্যার দৃশ্য দেখে স্বামীর আত্মহত্যা, মসজিদে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে হিন্দুদের গানবাজনা নিষিদ্ধের ফতোয়া — এসব ঘটনার পর হয়তো সরকার এটিকে আবারও 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো,এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর প্রতিকার কবে হবে? বিচারহীনতার এই সংস্কৃতি বরং উলটো ফলই ডেকে আনে। কারণ অপরাধীরা জানে, শেষপর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

বাংলাদেশ যদি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ হতে চায়, তবে তাকে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতেই হবে — বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন সত্যিই থেমেছে, নাকি নীরবতার আড়ালে সেই সত্যকে ঢেকে রাখা হচ্ছে ?

কুমিল্লার এই ঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সমাজের মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

সংখ্যালঘুদের সর্ববৃহৎ সংগঠন সম্প্রতি একটি সতর্কতার সঙ্গে সংকলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর লক্ষ্যবস্তু হামলা ও হত্যার এক ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য ঘটনার তথ্য তুলে ধরেছে এবং সরকারের উপস্থাপিত তথ্যের সঙ্গে স্পষ্ট বিরোধিতা করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি মাত্র সাতাশ দিনে মোট ৪২টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে যে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশজুড়ে কমপক্ষে ৫২২টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এই তথ্য সরাসরি বিরোধিতা করে সরকারের সেই দাবির সঙ্গে, যেখানে সরকারি তথ্যে বলা হয়েছিল মাত্র ৭১টি ঘটনায় সাম্প্রদায়িক ঘটনা রয়েছে। ঢাকায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনটি জানিয়েছে, এসব ঘটনায় ৬৬ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৮টি নারী নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে,যার মধ্যে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ৯৫টি উপাসনালয়ে হামলা, ১০২টি বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ, জমি দখল, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ধর্মান্তর,নির্যাতন এবং ইসলাম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তারের মতো বহু ঘটনাও রয়েছে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ জানান, এই পরিসংখ্যানগুলো ২০২৫ সালের জানুয়ারি

থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয় সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত হয়েছে। ঐক্য পরিষদ ১৯ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার একটি ফেসবুক পোস্টেরও তীব্র সমালোচনা করেছে। ওই পোস্টে বলা হয়েছিল যে, তদন্তে ২০২৫ সালে সংখ্যালঘু সংশ্লিষ্ট ৬৪৫টি ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৭১টিকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বাকি ৫৭৪টিকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনীন্দ্রকুমার নাথ প্রশ্ন তোলেন,সরকারের তথ্য অনুযায়ী যদি হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, জমি দখল কিংবা মন্দিরে হামলার মতো ঘটনাগুলোকে কীভাবে অসাম্প্রদায়িক বলা যায়? তিনি আরও প্রশ্ন করেন,সাতক্ষীরা, নাটোর, সাভার, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নরসিংদী, রাজবাড়ী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও পিরোজপুরে সংখ্যালঘু হত্যার ঘটনাগুলোকে কীভাবে অসাম্প্রদায়িক বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? কারণ এসব ঘটনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হিসেবেই চিহ্নিত করেছে।

ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ৫২২টি ঘটনার মধ্যে ৯৫টি উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখল বা দখলের চেষ্টার ২১টি ঘটনা রয়েছে। এছাড়া অপহরণ, চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের ৩৮টি ঘটনা, শারীরিক আক্রমণ ও মৃত্যুর হুমকির ৪৭টি ঘটনা, এবং ইসলাম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের ৩৬টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। কমপক্ষে ৬৬টি ঘটনায় বাড়িঘর, জমি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জোরপূর্বক দখলের ঘটনা রয়েছে। সংগঠনটি সংখ্যালঘু নেতাদের হয়রানি ও অপরাধীকরণের ঘটনাকেও নিন্দা জানিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হাটহাজারীর পুণ্ডরিক ধামের প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর বিনা বিচারে দীর্ঘ সময় কারারুদ্ধ রাখা এবং ঐক্য পরিষদের কয়েকজন বরিষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়েরের বিষয়টি, যার ফলে অনেককেই আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঐক্য পরিষদ সতর্ক করে দিয়েছে যে নির্বাচনের সময়কালেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তারা ৪২টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যার মধ্যে ১১টি হত্যা, একটি ধর্ষণ, মন্দির ও গির্জায় ৯টি হামলা এবং লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও জমি দখলের ২১টি ঘটনা রয়েছে।

মণীন্দ্রকুমার নাথ আরও বলেন, চলমান সহিংসতা এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে এক গভীর ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। বিশেষ করে নারী, যুবক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আতঙ্ক আরও বেশি, যা তাদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকেও নিরুৎসাহিত করেছে।

ঐক্য পরিষদ নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, প্রচার প্রচারণায় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে এবং নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে।

অথচ বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল এক মহান আদর্শকে সামনে রেখে -- ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল এমন একটি দেশ গড়ে তোলা যেখানে ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের পরিচয় নয়, মানুষ হিসেবেই নাগরিকদের মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশ কি সত্যিই সেই আদর্শকে ধারণ করতে পেরেছে? ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, এই সংকট নতুন নয়। পাকিস্তান আমলে সংখ্যালঘুদের উপর যে চাপ ও বৈষম্য ছিল, স্বাধীনতার পরেও তার অনেক ছায়া রয়ে গেছে। 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বা পরবর্তীকালে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'-এর মতো বিষয়গুলি দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘুদের জমি ও সম্পত্তি দখলের একটি আইনি পথ তৈরি করেছিল। এর সুযোগ নিয়ে বহু স্থানে হিন্দু পরিবার তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি হারিয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতনের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে সংখ্যালঘু গ্রামগুলো টার্গেট হয়েছে, কখনো নির্বাচনের আগে বা পরে প্রতিশোধমূলক হামলা হয়েছে। আবার কখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে জেহাদি জনতাকে উসকে দেওয়া হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে;পরে দেখা গেছে অভিযোগের ভিত্তিই ছিল মিথ্যা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো,এই ধরনের ঘটনার বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে অপরাধীরা বারবার সাহস পায়, আর ভুক্তভোগীরা ক্রমেই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দেশ ছাড়ার কথা ভাবতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা কোনো বাইরের মানুষ নয়। এই মাটিতেই তাদের শিকড়, এই দেশেই তাদের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তবুও কেন বারবার তাদের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে?

একটি দেশের নৈতিক শক্তি নির্ভর করে সে তার দুর্বলতম নাগরিকদের কতটা নিরাপত্তা দিতে পারে তার উপর। যদি সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ নিজেদের নিরাপদ মনে না করে, তবে সেই দেশের গণতন্ত্র ও মানবিকতার দাবিও প্রশ্নের মুখে পড়ে। বাংলাদেশ যদি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ হতে চায়, তবে তাকে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতেই হবে — বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন সত্যিই থেমেছে, নাকি নীরবতার আড়ালে সেই সত্যকে ঢেকে রাখা হচ্ছে ?

কারণ ইতিহাসের কাছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, এই প্রশ্নের জবাব বাংলাদেশকে একদিন দিতেই হবে।

□

নির্বাচনে নাগরিক কর্তব্যের প্রতিফলন প্রয়োজন

২০২৬-এর ভোট মানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবার ভোট। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া একটি রাজ্যের ঋণের বোঝা শূন্য করার ভোট। রাজ্যের মানুষের মুক্তির জন্য ভোট। সার্বিক কল্যাণের জন্য সংহত কর্মকৌশল রচনার জন্য ভোট।

রামব্রহ্ম দেবশর্মা

(১)

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। এই লড়াই মূলত পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদর্শ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই নির্বাচন বোমার বিরুদ্ধে বইয়ের লড়াই, এই নির্বাচন তরোয়ালের বিরুদ্ধে কলমের লড়াই। কর্মসংস্থানের লড়াই। সংবিধান- সংকটের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সৌকর্য রক্ষা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই। এক অদ্ভুত রাজনৈতিক কদর্যতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাক্ষী থাকতে সারা দেশের মানুষ, সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ তাকিয়ে আছেন এই নির্বাচনের দিকে। নির্বাচনে আসুরিক শক্তির পরাজয় উদযাপন করবেন বলে প্রতীক্ষা করে আছেন। তাই সমগ্র মানবজাতির নজর এই নির্বাচনটি ঘিরে। তাই নির্বাচন কমিশন, সদর্থক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ভোটকর্মী এবং সংবাদ ও সমাজ মাধ্যমের ব্যস্ততা ও তৎপরতা এখন তুঙ্গে। তবে একজন তন্নিষ্ঠ-ভোটার হিসেবে, সাধারণ মানুষ হিসেবে সবারই একটি বড়ো দায়িত্ব রয়ে যায়। তা হলো, সেরা ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠানো, নির্ভরযোগ্য দলের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়া। যাতে অনুপ্রবেশকারীরা এবং ভয়ঙ্কর কোনো শক্তি রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, প্রতিবেশী দেশ থেকে অশুভ শক্তি রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে না পারে। বিদেশি ষড়যন্ত্রে রাজ্যের আনাচেকানাচে ছদ্মবেশ ধারণ করে স্লিপার-সেল হয়ে থাকতে না পারে। যাতে দেশীয় এজেন্টদের চক্রান্তে রাজ্য নিরন্তর অস্থির হয়ে না যায়। প্রার্থী নির্বাচন করার কাজটি কঠিন এজন্যই যে, আমরা অনেকসময় দেশের শত্রুকে এবং দেশীয়

সংস্কৃতির শত্রুকে সঠিকভাবে চিনতে পারি না। অনেকানেক খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারে আমরা বিভ্রান্ত হই। যে সংবাদমাধ্যমগুলি অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করে, তারা ভোটের সময়ও মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায় ভোটারদের ঠকিয়ে অসৎ ও দুর্নীতি পরায়ণ দলের পক্ষে ভোটবাক্স ভরিয়ে দিতে। যেহেতু কাগজে প্রকাশিত সংবাদকে ভোটাররা বেদবাক্যের মতো মনে করে, তাই প্রতারণার সম্ভাবনা থেকে যায়। যারা সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা ভোটের সময় সঠিকপক্ষ অবলম্বন করতে পারে না। আমরা তাই নির্মোহদৃষ্টিতে দেখাতে চাই, যোগ্য প্রার্থী এবং যোগ্য দল বেছে নেবার উপায়গুলি কী কী! সকাল সকাল সপরিবার কষ্ট স্বীকার করে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোট নিজে কেন দেবো? নোটা-তে বোতাম টেপা কেন অনুচিত, বিনা কারণে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী দলকে অহেতুক বয়কট করার ডাক কেন আমাদের উপেক্ষা করা উচিত— এইসব বিষয়ই এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

(২)

ভোটারের প্রথম কাজ হচ্ছে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া। গুন্ডাবাহিনীর পোষা পেশীশক্তি থাকে। তারা দুর্নীতির এমন ঘোলাটে আবহ তৈরি করে যে, মারাত্মক দুর্নীতিও তখন অপরাধ বলে মনে হয় না। তাই সংবাদমাধ্যমের মিথ্যা বুলি সত্ত্বেও একজন যোগ্য ও সেরা প্রার্থীকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

কীভাবে?

ভোটারকে 'ভোট-গোয়েন্দা' হতে হবে। উন্নয়ন না করে বোকা বানিয়ে, কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে, আপনার সন্তানকে চির-বেকার করে রেখে যারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়, তাদের থেকে সাবধানে থাকুন। প্রকৃত গোয়েন্দা কারও দ্বারা প্রভাবিত হন না। সবদিক ভেবেচিন্তে অপরাধীদের আগেই

তালিকা থেকে বাদ দেন। তাই প্রার্থী বিচারের সবচাইতে সেরা পদ্ধতি হলো অসৎ ও অযোগ্যদের তালিকা থেকে সরিয়ে রাখা। যে প্রার্থী আপনাকে বোকা বানিয়ে আগে জিতেছে, যারা দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে, যে ব্যক্তির কাছে রাজনীতি হচ্ছে 'টাইম-পাস', যে জেতার পর সাধারণ মানুষকে ভুলে যায়, পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থকদেরই সবকিছু পাইয়ে দেয় যারা, তোষণের রাজনীতি করে যারা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিপরীতেই সবসময় কথা বলে যারা, মা-বোনের শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয় না যারা, বাংলাভাষার উপরে নেমে আসা মরু-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না যারা— আপনি নিশ্চয়ই তাদের ভোট দিয়ে 'আত্মঘাতী' হতে চাইবেন না!

ভোট দেবার আগে আপনাকে ভাবতে হবে, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব কে রয়েছেন? কে সত্যিই আপনার সমস্যা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারবেন, আপনার জন্য সুবিচার এনে দিতে পারবেন। এমন উপযুক্ত প্রার্থীই আপনি নির্বাচন করুন।

(৩)

কোন দলের হাতে রাজ্যের শাসনভার নিরাপদ ও যথোপযুক্ত, তা ঠিক করবেন কীভাবে? প্রথমে বুঝে নিন নির্বাচনটির বিস্তৃতি কী! লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা না পঞ্চায়েত ভোট এটি! যেহেতু ২০২৬-এর ভোট বিধানসভা নির্বাচন, যেহেতু এটি মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী সুনিশ্চিত করার ভোট, তাই এমন দলকে ক্ষমতায় রাখবো যে দল অন্য রাজ্যেও দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য যোগ্য মন্ত্রী উপহার দিয়েছেন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, দুর্জন-শক্তিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। নেতৃত্বের মুখটি হবে সর্বোত্তম, রাষ্ট্রবোধের ধারণা-সঞ্জাত এবং উজ্জ্বল ভাবেই প্রাসঙ্গিক। শাসক হিসেবে ধোঁয়াশা থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না, তোষণের রাজনীতি থাকবে না, ভারত বিরোধিতা থাকবে না। গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরার মানসিকতা থাকবে না। এমন দলকে জেতাবো, যে দল রাজ্যের নিরাপত্তা যথাযথভাবে অটুট রাখতে সক্ষম হবে, যে দল দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাভিমান রক্ষায় কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শামিল হবে, প্রাদেশিক সহস্রাধিক বছরের ঐতিহ্যকে পদদলিত করে চলে যাবে না যে দল— তাদের হাতেই মূল্যবান ভোটটি অর্পণ করে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করবো আমরা। আমরা চাইবো না আমাদের দেওয়া ভোটটি অর্পণ করে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করবো আমরা। আমরা চাইবো না আমাদের দেওয়া ভোটটি নষ্ট হোক। আমরা চাইবো, বিবেচনা করে যে দলকে ভোট দিলাম সেই দলই যেন ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে এক লক্ষ্যে পথ চলে। উন্নতির লক্ষ্যে সমগ্র দেশ যে সদর্থক পথে চলছে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গ যেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়! নোয়াখালির বীভৎস স্মৃতি নিয়ে সন্দেশখালির মতো অসংখ্য প্যাকেট ও পকেট যাতে তৈরি হয়ে না যায়। রাজ্যে শক্তিশালী সরকার যে দল দিতে পারে, মজবুত অর্থনীতি যে দলের লক্ষ্য, সামাজিক স্থিতি যে দলের অগ্রাধিকার— তাকেই ভোট দিতে হবে। সাধারণ ভোটার সবসময় চান ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও যেন সবদিক থেকে বিকশিত হয়। যে রাজনৈতিক দলের হাতে রাজ্যের সার্বিক সমৃদ্ধি ঘটবে, বঙ্গমাতার সঙ্গে দেশমাতা গৌরবশালিনী হবেন, ভব্য ভারতের সঙ্গে সোনার বঙ্গের ভিত গড়া সম্ভব হবে, সেই দলকেই আমাদের জয়ী করতে হবে।

(৪)

প্রার্থী ঠিক করালাম, পছন্দের দলও ঠিক করালাম, চিন্তার সমন্বয় ঘটালাম, অথচ নিজে ভোট দিতে গেলাম না! ভাবলাম আমি ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলেও ভোটের চলতি হাওয়ায় সে প্রার্থী অথবা সেই দল জিতে যাবে— তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভোটের সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়, রিগিং হয়, প্রভূত পরিমাণে ছাপ্পা ভোট পড়ে। সারা দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রক্তেরাঙা ভোট হয়, বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এটা এজন্যই সম্ভব হয়, সবমানুষ সপরিবার ভোটে শামিল হন না, 'গণতন্ত্রের পূজা' করেন না। ভালোমানুষ যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীরব থাকেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন না, তখন পেশিশক্তি বুঝে যায়, তারা ফাঁকা মাঠ পেয়ে গেছে; ভোট দুর্নীতি অবাধে চালাতে পারবে। সবাই ভোটের ময়দানে না নামলে, সকাল সকাল নিজের নিজের ভোটটি দিতে না পারলে পছন্দের দল কিংবা প্রার্থী জিততে পারবে না। আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার আপনাকেই প্রয়োগ করতে হবে। তবে গণতন্ত্রের জয় হবে, তবে গণতন্ত্রের পূজা সম্পন্ন হবে।

নোটা-তে ভোট দেওয়া একটি খারাপ প্রবণতা, নিজের ভোটটি হেলায় বিনষ্ট করবেন না। অনেক সময় অনেক রাজনৈতিক দল অন্য দুষ্ট দলকে জিতিয়ে দেবার জন্য, নোটা-তে ভোট দেবার জন্য পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করে। তারা 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' করে। এইরকম দুষ্টদলগুলি সম্পর্কে সাবধানে থাকা উচিত। অনেক নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় খুব সামান্য ভোটের ব্যবধানে ভালো, সৎ এবং উপযুক্ত প্রার্থী পরাজিত হয়ে গেছেন। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা এই, নোটা-তে ভোট মানেই অযোগ্য এবং নিকৃষ্ট প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট স্বীকার করছেন, অথচ নোটা-য় ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের স্ফূরণ করতে পারছেন না, তা কী সুখকর হবে? তাই এই নেগেটিভ বা নঞর্থক ভোট থেকে বিরত হতে হবে এবং অন্যদেরও বিরত করতে হবে।

পরিশেষে বক্তব্যটি দাঁড়ালো, সেরা প্রার্থী ও সেরা দল বাছার সূত্রগুলি অনুসরণ করবো, রাজ্যকে বিকশিত করবো এবং রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পরম বৈভবশালী ভারত গঠনে নিজেদের শামিল করবো। ২০২৬-এর ভোট মানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবার ভোট। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া একটি রাজ্যের ঋণের বোঝা শূন্য করার ভোট। রাজ্যের মানুষের মুক্তির জন্য ভোট। সার্বিক কল্যাণের জন্য সংহত কর্মকৌশল রচনার জন্য ভোট। এই ভোটকে হালকাভাবে নেবেন না। আপনি জিতুন, রাজ্যকে জিতিয়ে দিন। □

শ্রীরামচন্দ্র একসূত্রে বেঁধেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষকে

গোপাল চক্রবর্তী

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে সেই ত্রেতাযুগে বিশাল ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কোনো সদ্ভাব ছিল না। শক্তিশালী বৃহৎ রাজ্যগুলিও পরস্পর বিরোধিতায় রত থাকত। সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষদের কোনো মর্যাদা ছিল না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ছিল লঙ্কাধিপতি রাবণের দ্বারা প্রভাবিত অসুর সংস্কৃতির ধারক। শ্রীরামচন্দ্র নিম্নবর্ণের মানুষদের দিলেন যথাযোগ্য মর্যাদা। আর্যাবর্তের রাজ্যগুলির মধ্যে করলেন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন। দক্ষিণ ভারতকে আসুরিক সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করলেন আর্য সংস্কৃতির।

এক পুণ্যতিথিতে দশরথ চারপুত্র নিয়ে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। সুদীর্ঘপথ, কিছু পথ অতিক্রম করার পর দেখেন অসংখ্য অনুচর নিয়ে গুহকে চণ্ডাল পথ আগলে আছে। গুহকের অনুযোগ, দশরথ বারবার এইপথ দিয়ে সসৈন্যে যাতায়াত করার ফলে তার রাজ্যের বাড়ি ঘর ভাঙছে, ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। তাই দশরথকে অন্য পথে যেতে হবে, যদি এপথে যেতে হয় তবে শ্রীরামচন্দ্রকে তার সামনে আনতে হবে। গুহক তখন উচ্চস্বরে 'রাম রাম' বলে ডাকতে লাগল। দশরথ রথের মধ্যে রামকে লুকিয়ে রেখে, অস্ত্র হাতে অগ্রসর হলেন এবং গুহককে বন্দি করলেন। বন্দি অবস্থায় গুহক পা দিয়ে ধনুকে বাণ যোজনা করে শত্রু পক্ষের দিকে নিক্ষেপ করছে। ভরত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে রামকে জানায়, শ্রীরাম কৌতূহলবশত গুহকের সামনে আসেন। শ্রীরামের দর্শনে গুহকের শাপ মুক্তি হয়। শ্রীরামের অনুরোধে দশরথ গুহককে মুক্তি দেন। শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল গুহককে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন।

আপন যজ্ঞস্থলকে রাক্ষসদের উপদ্রব থেকে মুক্ত করার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের অনুমতি ক্রমে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নিয়ে চলেছেন যজ্ঞস্থলের দিকে। সুদীর্ঘ পথ, কত নগর, জনপদ, তীর্থক্ষেত্র, তপোবন, সাধনক্ষেত্র, স্রোতস্বিনী। কত জাতি, উপজাতি, বিচিত্র পেশার মানুষ। বিশ্বামিত্র একে একে পরিচয় করাচ্ছেন সবকিছুর সঙ্গে। ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হলো কিশোর শ্রীরামচন্দ্রের।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছেন বিশ্বামিত্রের তপোবনের দিকে। পথে ভয়ঙ্কর তাড়কা বন। এই বনেই থাকে ভয়াল ভীষণা তাড়কা রাক্ষসী। বিশ্বামিত্রের আদেশে শ্রীরামচন্দ্র বধ করলেন এই হিংস্র ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে। বিশ্বামিত্র শুরু করলেন যজ্ঞ। তাড়কার পুত্র মারীচ, অনুচর সুবাহু, অসংখ্য

রাক্ষস নিয়ে যজ্ঞস্থল অপবিত্র করে ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটাতে লাগল। যজ্ঞরক্ষক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মানবাস্ত্র প্রয়োগ করে সুবাহুকে নিহত করলেন, করুণাবশে মারীচকে হত্যা না করে নিক্ষেপ করলেন বহু দূরে সমুদ্রগর্ভে। অনুচর রাক্ষসদের অনেকে নিহত হলো, অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল সেই বন ছেড়ে। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ।

এবারে গন্তব্য রাজর্ষি জনকের রাজ্য মিথিলা। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য জনকের প্রাসাদে রক্ষিত সেই বিখ্যাত হরধনুতে গুণ যোজনা করে শ্রীরামচন্দ্র জানকী সীতার পাণিগ্রহণ করুক। যে ধনুতে অদ্যাবধি কোনো রাজা বা রাজপুত্র গুণ যোজনা করতে সক্ষম হয়নি। মিথিলার পথে চলতে চলতে আবার বিশ্বামিত্র সেই সব উপাখ্যান বলতে থাকেন। পথে কত দেশ, কত জনপদ। তার সঙ্গে জড়িয়ে কত ইতিহাস, পুরাণ। যেতে যেতে এক নির্জন হতশ্রী তপোবন দেখিয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন—

—বৎস রাম, এ এক অভিশপ্ত স্থান। কিন্তু একদিন দেবগণপূজিত স্বর্গাশ্রমের মতো পবিত্র ছিল। মহর্ষি গৌতম তাঁর পত্নী ব্রহ্মার কন্যা অহল্যার সঙ্গে এখানে তপস্যা করতেন। একদিন মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হন। গৌতমমুনি ফিরে এসে দুজনকেই অভিশাপ দিলেন। গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র ভগচিহ্ন হলো আর অহল্যা পাষাণে রূপান্তরিত হলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে অহল্যার শাপমুক্তি হবে। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে শ্রীরামচন্দ্র চরণ রাখলেন সেই পাষাণের উপর, উদ্ধার হলেন অহল্যা।

এরকম একটি ধারণা অনেকে পোষণ করেন যে অহল্যা ভূমির প্রতীক। যেখানে 'হল' অর্থাৎ লাঙল চলেনি। রবীন্দ্রনাথ এরকম একটি অর্থ দেখেছেন। ভূমির সঙ্গে বর্ষার দেবতা ইন্দ্রের একটা সম্পর্ক আছে, এ থেকেই হয়তো পরবর্তীকালে ইন্দ্র অহল্যার গল্পটি সৃষ্টি হয়েছে।

আবার পথচলা। দীর্ঘ পথ কিন্তু কারও ক্লান্তি নেই। প্রকৃতির বৈচিত্র্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছে, আর ঋষি বিশ্বামিত্র এরকম পরিক্রমায় অভ্যস্ত। মিথিলা নগরের হর্ম্যরাজি ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গুরুকুলের বিদ্যার্থীদের উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রপাঠ। নির্মল প্রভাতের পুণ্য ঘোষণা করে রাজা জনকের রাজভবনে মঙ্গল আরতির বাদ্য বেজে উঠল। রাজা জনক স্তোত্র, মন্ত্র পাঠ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন। বিশ্বামিত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পরিচয় করালেন জনকের সঙ্গে। শ্রীরাম লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে অত্যন্ত প্রীত হলেন রাজর্ষি জনক। তাদের আপ্যায়ন ও উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো।

কুশল বিনিময়াদিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো। এবার বিশ্বামিত্র জনককে বললেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ হরধনু দেখতে আগ্রহী। জনক বললেন— মহর্ষি আপনার আজ্ঞায় আমি হরধুন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করাব। তার আগে প্রতিজ্ঞা করছি, শ্রীরামচন্দ্র যদি হরধনুতে গুণযোজনা করতে পারেন তবে তাঁর হাতে আমি কন্যা সীতাকে অর্পণ করব।

শ্রীরামচন্দ্র সেই পৌরাণিক হরধনু দর্শন ও প্রণাম করে তাতে শর সংযোজন করতে গেলে প্রচণ্ড শব্দে সেই হরধনু ভেঙে গেল। স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, ঋষিরা বেদমন্ত্র পাঠ করলেন। মিথিলার দূতের কাছে সংবাদ পেয়ে অযোধ্যা থেকে সপারিষদ রাজা দশরথ মিথিলায় এলেন সঙ্গে ভরত এবং শত্রুঘ্ন। অগ্রণী হয়ে এলেন কুলগুরু বশিষ্ঠ। মিথিলার সীতা আর অযোধ্যার রাম তপঃ ও তেজের যুগলমূর্তি।

জ্ঞান সাধনা, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মিথিলা। অন্যদিকে অযোধ্যা হলো ধর্মের, বীরত্বের, সমৃদ্ধির রাজ্য। মিথিলার জ্ঞান আর অযোধ্যার গরিমা। এই দূরে মিলে আর্য ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড। ভারতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিভা।

এই সম্বন্ধকে অটুট ও নিশ্চিত করার জন্যই বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ দশরথের চার কুমারকে একই পরিবারে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। শুভকার্য সম্পন্ন হতে বিলম্ব হলো না। একই বাসরে বিবাহ সম্পন্ন হলো— শ্রীরামের সঙ্গে সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্মিলার, কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের। রামসীতার বিবাহে ভারতের সেই সুপ্রাচীন মহত্ত্বই পুনরুজ্জীবিত হলো। ভারত সভ্যতার স্বর্ণযুগ 'রাম রাজত্ব' রূপে শ্রেষ্ঠ আদর্শ লাভ করল।

এর মধ্যে সরযূনদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। পরশুরামের দর্পচূর্ণ করে শ্রীরাম সপরিবারে অযোধ্যায় ফিরেছেন। অযোধ্যা নগরী আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেল। কিছুদিন পরে রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে শ্রীরামকে যেতে হলো বনবাসে। সঙ্গী সহধর্মিণী সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ। পথে বিশাল গঙ্গা অতিক্রম করতে হবে, খেয়া পারের কাণ্ডারি সেই গুহক। গুহকের অনুরোধে একরাত্রি তাঁরা সেই বনে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু। আবার পথ চলা, অনেক কান্তার, বন পেরিয়ে পঞ্চবটীতে কুটীর স্থাপন, সেখান থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। সীতার অন্বেষণে জটায়ু নির্দেশিত পথে যাত্রা।

এই পথেই মতঙ্গমুনির আশ্রমে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করছে শরবীমাতা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন অপেক্ষায়। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে আত্মহারা শবরী। তার উচ্ছিষ্ট ফল মহানন্দে গ্রহণ করলেন শ্রীরামচন্দ্র। প্রতীক্ষার অবসান হলো শবরীর, উদ্ধার হলো সে।

এবার গন্তব্য কিষ্কিন্ধ্যা। এখানে হনুমানের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিলন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন, বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে অতিষিক্ত করা এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাবণের পরম মিত্র এবং অসুর সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক বালী। বালী বধের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতের অসুর সংস্কৃতির ধ্বংসের সূচনা।

বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা আর এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিভীষণ রাক্ষস হলেও পরম বৈষ্ণব, আর্য সংস্কৃতির পূজারি। রাবণের বিনাশ ঘটিয়ে সীতা উদ্ধার এবং বিভীষণকে লঙ্কাধীশ করে শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। লঙ্কা অভিযানের সময় সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, জনপদ শ্রীরামচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিল তারা আজ আর্য সংস্কৃতির অন্যতম ধারক, বাহক। □

রান্নার গ্যাস নিয়ে রাজনীতি না জনস্বার্থে?

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রান্নার গ্যাসকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান রান্নার গ্যাসকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। বিরোধী মহলের অভিযোগ, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দল তাদের অবস্থানকে জনস্বার্থের প্রশ্ন বলে তুলে ধরছে। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গে রান্নার গ্যাসের সমস্যাকে একটি বড়ো রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, যেসব পরিবারে আগে মাসে একটি সিলিন্ডারেই রান্নার কাজ চলত, সেখানে এখন আতঙ্ক সৃষ্টি করে একাধিক সিলিন্ডার বুক করানোর প্রবণতা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকটের পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের অন্যতম মুখ সন্তু শিকদার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'রান্নাঘরের মতো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিসরকে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্র বানানো অত্যন্ত দুঃখজনক। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক লাভ তোলার চেষ্টা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনকে সামনে রেখে আতঙ্ক ছড়ানোর রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত।' রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ জগন্নাথ মণ্ডল বিষয়টিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে বলেন, ''রাজনীতির ময়দানে মতাদর্শের লড়াই থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু গৃহস্থের হেসেলকে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ করে তোলা এক ধরনের সামাজিক অপরাধ। নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন অনেক সচেতন; তারা বাস্তবতা বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবে।''

অন্যদিকে দেবর্ষি বিশ্বাস, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম নেতৃত্ব হিসেবে পরিচিত, তিনি বলেন--- 'কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কিছু মহল কাজ করছে। কিন্তু মানুষ জানে যে দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অপপ্রচারে বিশ্বাস না করে বাস্তব পরিস্থিতিতে সামনে রেখেই বিচার করছে।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রান্নার গ্যাসের মতো একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের ইস্যু সাধারণ মানুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে সাধারণ মানুষই। রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য ও পালটা বক্তব্যের ভিড়ে রাজ্যের নাগরিকরা বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করবেন— এটাই গণতন্ত্রের মূল শক্তি।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

সময় বড়ো বলবান

সময় বড়ো বলবান। বার বার আমরা এই কথা শুনে এসেছি। সময় প্রমাণ করে দিয়েছে যে, রাজ্যের শাসক দলের বাঙ্গালি প্রেম কতটা মেকি। বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল। স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সর্বভারতীয় নেতা ও নেত্রীরা ছড়িয়ে আছেন। আর এনারাই যে কোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ছড়িয়ে পড়েন, দলকে জেতাবার জন্য। তৃণমূল কংগ্রেস মুখেই বলে তারা হলো সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের না আছে নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি। না আছে সারা ভারতে তাদের সংগঠন। তাই নেতাও নেই। যেটা আছে বিজেপির। ২০টি রাজ্যে আছে তাদের সরকার। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিজেপির নেতারা আসলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে বাঙ্গালি বিরোধী ন্যারেটিভের জন্ম দিয়েছে। কিছু চটিচাটা মিডিয়া আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। কিন্তু তারা কোনোদিন বলেনি তৃণমূল যাদের সাংসদ ও নেতা বানিয়েছে তারা একসময় বিজেপির নীতি আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। তারা ব্যক্তিগত সংঘাতের জন্য বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছে। এক্ষেত্রে কীর্তি আজাদ ও শত্রুঘ্ন সিনহা উল্লেখযোগ্য। এবার তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ৪টি আসনের ২টিতেই অবাঙ্গালিদের প্রার্থী করেছে। অর্থাৎ ৫০ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এবার সেটা ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছে। মুখে বাঙ্গালি অস্মিতার কথা বলে রাজ্যসভার নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে তৃণমূল বেইমানি করেছে।

বিজেপি নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যসভায় এবারের ৭৫ আসনের নির্বাচনের পর বিজেপি + সংখ্যা ১৬১ ছাড়িয়ে যাবে। এই পরিমাণ সংখ্যা জিততে পারেননি জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধী। লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা করে দেখিয়েছেন। অনেক দরকারি বিল নিম্নকক্ষে পাশ করার পর রাজ্যসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকার কারণে কংগ্রেস ও তাদের দোসর বামপন্থী ও তৃণমূল কংগ্রেস আটকে দিত। সময় বদলেছে। শক্তিশালী বিজেপি নতুন ভারত গড়ার পথে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে। একেই বলে সময় বড়ো বলবান। বুঝতে বাকি নেই বিজেপি তাদের এই শক্তি দেশের কল্যাণে কাজে লাগাবে।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

‘জামাতি বাংলা’ না পশ্চিমবঙ্গ ?

Aided growth বলে একটা কথা ধনবিদ্যায় চালু আছে। এর অর্থ হলো দেনা করে ধনী হওয়া। বিষয়টা একটু খুলে বলি। মনে করি অমল মাসে ৫০ হাজার টাকার চাকরি পেয়ে বাইক, আই ফোন আর ২৫ লক্ষ টাকার একটা ফ্ল্যাট কিনে মাসে মোট ৩০ হাজার টাকা ইএমআই দেয়। অন্যদিকে বিমল ৪০ হাজার টাকার চাকরি পেয়ে বাসে, মেট্রোয় যাতায়াত করে। পনেরো হাজার টাকার মোবাইল ব্যবহার করে ও পাঁচ হাজার টাকার ফ্ল্যাটে বাস করে মাসে এক টাকাও ইএমআই দেয় না এবং সেই সঙ্গে মাসে দশ-পনেরো হাজার টাকা করে এসআইপি করে।

এক্ষেত্রে চীন যদি অমল হয় ভারত বিমল। বেজিং শহরে মেট্রোর ন্যূনতম ভাড়া ভারতীয় মুদ্রায় তিরিশ টাকা। কলকাতায় সেটা পাঁচ টাকা। বেজিঙে একটা মালয়েশিয়ার কলার দাম ভারতীয় মুদ্রায় পঁচিশ টাকা। কলকাতায় একটা চন্দননগরের বা ভুশোয়ালের কলা পাঁচ টাকা। চীনের মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ তার জাতীয় আয়ের ৩০০ শতাংশ। ভারতে সেটা ১৫৫ শতাংশ।

আবার একই সঙ্গে চীন বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ে বিশ্বে এক নম্বরে (৩.৪৩ ট্রিলিয়ন ডলার)। ভারতের ৭২৬ বিলিয়ন ডলার। এখনো ট্রিলিয়ন ছোঁয়নি।

আমরা যদি চীন ভারতের মতো মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করি তাহলে দেখবো আয়ে ঋণের অনুপাত মহারাষ্ট্রে যেখানে ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে। চীনের জাতীয় আয় ভারতের আড়াই গুণ বেশি। একই ভাবে মহারাষ্ট্রের আয় পশ্চিমবঙ্গের আড়াই গুণ বেশি। ফলে মহারাষ্ট্র যেখানে ঋণের টাকা উন্নয়ন খাতে বা plan budget-এ খরচ করে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে দেনা করে আগের দেনার সুদ মেটায়, লক্ষ্মীভাণ্ডার বাড়ায় বা বারোয়ারি আমোদে খরচ করে।

ভোটের মুখে বাঙ্গালি আজ হবসন চয়েসে ভুগছে। কাকে চাইবে মহারাষ্ট্র না পশ্চিমবঙ্গ? চীন না ভারত? যাকেই চাক না কেন, রাজকোষ-ই আসল কথা।

সবার উপর যে ভাবনাটা আগের কোনো ভোটে ভাবায়নি সেটা হলো বাঙ্গালি কোনটা চাইবে ‘জামাতি বাংলা’ না পশ্চিমবঙ্গ?

—কুণাল চট্টোপাধ্যায়,
বরাহনগর, কলকাতা-৩৬।

হোলিতে দিল্লির উত্তমনগরের মর্মান্তিক ঘটনা ও শিক্ষা

হোলির দিন দিল্লির উত্তমনগরের মর্মান্তিক ঘটনা দেশের সভ্য সমাজকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অথবা সেকু-মাকুদের কোনো মিটিং-মিছিল বা কোনো প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায়নি। বস্তুত, তাদের চরিত্রটাই এরকম। দোলের মতো আনন্দের আবহে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যার ঘটনার জন্য হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুরোধ করব যে তারা যেন হিন্দুদের কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানের সময় ঘরেই বসে থাকেন। যদি বাইরে বের হন তাহলে সামনে-পেছনে নিজের মজহব লিখে রাখুন। হিন্দুদের কাছে আনুরোধ যে তারা যেন ওই সম্প্রদায়ের বা অনিচ্ছুক মানুষদের রং না দেন। কারণ তাদের মজহবে আর্ট, আনন্দ, গান-বাজনা নিষিদ্ধ। তাই তারা সবসময় একটা স্ট্রেসে ভোগে।

দিনে পাঁচবার মাইকের মাধ্যমে আজান দিয়ে এদের স্ট্রেস তৈরি করা হয়। কজন হিন্দু জানেন এই আজানের অর্থ? একবার জেনে নিন তাহলেই বুঝতে পারা যাবে এদের স্ট্রেসের কারণ।

● আল্লাহু আকবার(২ বার)— আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

● আসহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহা। (২বার) — আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লা আর ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

● আশাদুল্লা আল্লাহ্ মুহাম্মাদার রাসুরুল্লাহ্ (২ বার) — আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে মুহাম্মদই আল্লাহ্র একমাত্র রসুল।

● হাইয়া আলাস সালাহ্ (২ বার)— নামাজের দিকে এসো।

● হাইয়া আলাল ফালাহ্ (২ বার)— সফলতার দিকে এসো।

● আল্লাহ্ আকবার (২ বার) --- আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

● লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ — আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

সকালের আজানে অতিরিক্ত একটি লাইন থাকে—

● আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাউম (২বার) — ঘুম থেকে উঠে নামাজ খুব ভালো।

দিনে-রাতে পাঁচবার এসব শুনতে শুনতে মুসলমানরা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। তাই যেসব হিন্দু আজান শুনেতে খুব ভালোবাসেন তারা এর অর্থ অনুধাবন করুন। যখন এদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে তখন সন্ধ্যায় আপনার বাড়ির শঙ্খধ্বনি বন্ধ হয়ে যাবে।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

With Best Compliments From -

A
Well Wisher

স্বয়ংসিদ্ধা নারীশক্তির উন্মেষ লগ্নে

শুক্লা শিকদার

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী শক্তির প্রতীক। নারী ঐশ্বর্যের ধারক ও বাহক। নারী অনুপ্রেরণার সূত্র। বৈচিত্র্যের দেশ, ঐতিহ্যের দেশ ভারতবর্ষে নারী কখনো মাতৃরূপে বন্দিত, কখনো আবার দেবীরূপে পূজিত, কখনো আবার দেবীরূপে পূজিত, কখনো আবার এই দেশই নারীরূপে মাতৃকা। জন্ম থেকেই সন্তানরা যার জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

ভারতবর্ষে দেবীরূপে পূজিত হয় নারীর বিভিন্ন রূপ। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে নারী 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। বিদ্যাং দেহি, জয়ং দেহি, ধনং দেহি' বলে স্তুতি করা হয়েছে। নারীর ঐতিহাসিক অবদান গাথাও কম নয় ভারতে। বৈদিককালে যেমন গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারীর অবস্থান ভাস্বর ছিল। ঠিক তেমনি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো সাহসিনী নারীরা।

ভারতের নবজাগরণের হোতা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের সংকল্প নিয়ে নারী শিক্ষা ও নারীর অগ্রগতির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনি বা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় নারীর সশক্তীকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী থেকে লীলা নাগ, মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে কনকলতা বড়ুয়া— নবজাগরণের বঙ্গ থেকে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সমাজ গঠনে নারীদের অবদান সর্বজনবিদিত।

তবে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতে বাস্তবের মাটিতে ভারতীয় তথা বঙ্গ নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থান সম্পর্কে আজও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। সাংসারিক জীবনে নারীদের অবিরাম নিঃস্বার্থ ক্রিয়াশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য যেন আজও বাস্তবের মাটিতে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। ব্যতিক্রমী কিছু নারীকে বাদ দিলে আজও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সবেতন চাকরি, সম্পত্তির অধিকার এই সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

আজও সাংসারিক জীবনে অবরিত কাজ করে চলা নারী যেন ভুলেই গেছে যে তারও কিছু চাওয়ার রয়েছে, তারও কিছু আলাদা ভাবার রয়েছে, যা তাকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, অধিকার আদায়ের পন্থা দেবে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেবে। এনে দেবে সম্মান প্রসিদ্ধি, করে তুলবে আত্মনির্ভর। আর আত্মনির্ভর নারীই হতে পারে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ছিনিয়ে নিতে পারে নিজের প্রাপ্য। হয়ে উঠতে পারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারিণী। আর পাঁচজন পিছিয়ে পড়া নারীর জন্য হয়ে উঠতে পারেন অনুপ্রেরণার ভিত্তি।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে নারী স্বাবলম্বী হলে সে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয় সন্তানের বিকাশে। তাই নারীর স্বাবলম্বন এককথায় দেশের শিশু তথা দেশের সামগ্রিক বিকাশেরও সোপান।

ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যশালী দেশ যেখানে নারী বন্দিত হয় মাতৃরূপে, দেবীরূপে। যে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নারীর স্বাবলম্বন কোনোভাবেই একটি উপেক্ষিত পরিসর হিসেবে থাকতে পারে না। আজকের আধুনিক ভারতের দিকে দিকে উদ্যোগ হয়তো অনেক নেওয়া হয়েছে। অনেক নারী এগিয়ে এসেছেন, সফল হয়েছেন। তবে পরিসংখ্যান বলছে তা যথেষ্ট নয়। আজ ভারতের ৪২ শতাংশ নারী যেখানে কৃষিজ উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগ করেন সেখানে মাত্র ২ শতাংশ ভারতীয় নারী কৃষি জমির মালিকানা ভোগ করেন। চাকরির ক্ষেত্রে আজও ভারতে 'জেন্ডার পে গ্যাপ' ৩৪ শতাংশ অর্থাৎ একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একজন ভারতীয় নারী কর্মক্ষেত্রে সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন পুরুষের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম বেতন পেয়ে থাকেন।

ভারতের জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক নারী হলেও মাত্র এক চতুর্থাংশের কিছু কম সংখ্যক নারী 'লেবার ফোর্সে' অংশগ্রহণ করেন অর্থাৎ সাংসারিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শ্রম দান করলেও নারীদের শ্রমের মাত্র এক চতুর্থাংশেরও কম অংশ ভারতের জিডিপিতে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে ভারতের বাজারে শ্রম বিনিয়োগে নারীদের অত্যন্ত কম অংশগ্রহণ দেখে এটা মনে হয় যেন ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য তার নারীশক্তিকে ভুলেই গেছে। ভারতের নারীশক্তিকে এবং নারীদের সঠিক মূল্যায়ন ও প্রয়োগ ছাড়াই ভারত অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। চিত্রটা একটু অন্যরকম হতে পারত, নারী শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এগোলে, ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রতি বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারত যদি ভারতের শুধুমাত্র ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেক নারীশক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগ করত। তবে সমাধান কোথায়? এবং তার ভিত্তিই-বা কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে ১৯৭১ সালে। কারণ ভারতে ১৯২১ সালে গান্ধীজী সেবাগ্রাম প্রকল্পের সময় সেলফ হেলফ গ্রুপের ধারণা দিয়েছিলেন। বর্তমানে নারীদের ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা গ্রুপে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম করে তুলতে সেলফ হেল্প গ্রুপ অন্যান্য অনেক পন্থার পাশাপাশি একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা। 'ভারত সেলফ এমপ্লয়েড ওমেন'স অ্যাসোসিয়েশন (বেবা)'। ১৯৭০ সালে গুজরাটের আমেদাবাদের ইলা বেন 'সেবা' সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নারীদের সঙ্গে মাইক্রোফিনান্সের সংযোগ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে 'সেবা'-র গ্রামীণ মডেলের প্রকাশ ঘটে। □

যে কারণে প্রতিদিন করলা খাবেন

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

করলার তিতা স্বাদ অপছন্দ অনেকেরই। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, পুষ্টিগুণে ভরপুর সবজির তালিকা করা হলে করলা থাকবে একেবারে উপরের দিকেই। করলায় রয়েছে প্রোটিন, আয়রন, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক, কপার-সহ আরও অনেক ভিটামিন ও মিনারেল। পাশাপাশি ডায়াটরি ফাইবার, ক্যালসিয়াম, বিটা-ক্যারোটিনও পাওয়া যায় এটি থেকে। প্রতিদিন পাতে করলা রাখলে কী কী উপকার পাবেন জেনে নিন।

১. ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে :

ইনসুলিনের ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিকভাবে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে করলার জুড়ি নেই। নিয়মিত করলা খেলে রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

২. ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে :

প্রতিদিন করলার জুস পান করলে বা সেদ্ধ করলা খেলে বিপাকীয় শক্তি বাড়বে। ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় করলায়। ফলে নিয়মিত সবজিটি খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

৩. পুষ্টিগুণে ভরপুর :

করলা ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাসিয়াম, ফোলেট এবং আয়রন-সহ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ সেটা মেলে উৎকৃষ্ট পরিমাণে। ফলে প্রতিদিন সবজিটি খেলে দূরে থাকা যায় অনেক রোগ থেকে।

৪. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উৎস :

করলায় ফ্লয়ডোনয়েড ও পলিফেনল মেলে। শক্তিশালী এই দুই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এছাড়া উন্নত বিপাকীয় শক্তি নিশ্চিত করে এরা।

৫. হজমের গণ্ডগোল দূর করে :

করলায় থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে হজমে সহায়তা করে।

৬. অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে :

উপকারী অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে করলা অন্ত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৭. হার্ট ভালো রাখে :

কিছু গবেষণা বলছে, করলা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

৮. ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে :

করলার অ্যান্টিঅক্সিফাইং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে।

৯. ত্বক ভালো রাখে :

করলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো বার্ধক্যের লক্ষণ হ্রাস করে। এছাড়া শরীর থেকে দুষিত পদার্থ বের করে ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

১০. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

করলার ভিটামিন ও খনিজ, বিশেষ করে ভিটামিন-সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

১১. চোখ ভালো রাখে :

করলা ভিটামিন এ-র একটি ভালো উৎস, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। □

শ্রীরাম এক জীবনবোধ
ভারতের বিশ্বজনীন ইতিহাস

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রামই ভারতাত্মা :

রাম কেবল একটি নাম নয়। রাম হলো একটি বিশ্বাস। একটি জীবন বোধ। একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস। রাম মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন। রাম মানুষের নিত্যদিনের পথ চলার সঙ্গী। রাম একজন প্রকৃত অর্থে কর্মযোগী— যিনি সর্বার্থেই মানুষের প্রতিমুহূর্তের সহযাত্রী। রাম শাশ্বত সত্যের প্রতীক। রাম পথপদর্শক। রাম সৃজনের প্রেরণা। যাঁরা ধার্মিক, ধর্মপথে চলেন রাম তাঁদের আশ্রয়। আবার আত্মবঞ্চনা, কপটাচার যাঁদের কর্ম, তাঁরাও পথ চলেন কোনো না কোনো ভাবে ছদ্মরামভক্ত সেজেই।

সঠিক চিন্তনে স্থিত হওয়া যায় সত্যের পীঠভূমে। গহিন অন্ধকারের মধ্যেও রাম জ্যোর্তিময় আলোর উৎস। রাম আদর্শ জীবন এবং মূল্যবোধের সজীব, সাত্ত্বিক উপলব্ধি। রাম হলেন মর্যাদা-পুরুষোত্তম। সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্যের একটি বোধেরই নাম রাম। যে কোনো সঙ্কটে রামই ত্রাতা। রামই স্থিরতা। রামই ভারতাত্মা। রাম বিনা ভারতের অস্তিত্ব প্রায় অলীক কল্পনা মনে হতে পারে, এসব তত্ত্বকথা। কিন্তু এটাই সত্য ও শাশ্বত। শ্রীরাম একটি আদর্শ মানদণ্ড। কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষের জন্য নয় এই মানদণ্ড। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের, যে কোনো ধর্মের মানুষ যদি শান্তি-সন্ধানী হন তাহলে তাঁর সামনে আদর্শ হিসেবে দেখা দেবেন শ্রীরাম।

নানা অবক্ষয়, নানা অশান্তি, অকারণ নানা উত্তেজনার মুহূর্তে সুহাস শ্রীরাম হলেন সেই আলোকবিন্দু— যাকে লক্ষ্য করে এগোলে শান্ত হয় চিত্ত। সমস্যা উত্তরণের পথের দেখাও মেলে তখনই।

আদর্শ শ্রীরামই :

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পরিব্যাপ্ত শ্রীরাম। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, সর্বত্রই মানুষ আজ নিঃসঙ্গতার ব্যাধিতে জর্জরিত। আজ প্রায় সকলেই একা। পরিবার থেকেও নেই। অবিশ্বাস আর আত্মকেন্দ্রিকতায় প্রতিটি মানুষই যেন এক নির্জন দ্বীপে বন্দি। ভেঙে যাচ্ছে পরিবার, ভাই হচ্ছে ভাইয়ের শত্রু। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক হচ্ছে কণ্টকিত। এই রকম একটা অবস্থায় শ্রীরামের জীবনই দেখাতে পারে প্রকৃত পথ।

শ্রীরাম পরমপুরুষ। সবরকম পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শ্রীরাম যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তা আজও সকলের সব সমস্যার সুসমাধানের পথ-দিশারি।

শ্রীরাম যখন রাজা। রাজধর্মই তখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন। অপক্ষপাত তাঁর নীতি। প্রজা ও স্বজন, এমনকী নিজেকেও তিনি বসান সমাসনে। সে সময় রাজধর্মের মর্যাদা রাখতেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে মুহূর্তমাত্র সময় নেন না। তিনি যখন স্বামী তখন অন্য কোনো নারীকে দেখেন না। ভাইদের তিনি ভালোবাসেন নিজেরই মতোন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ভাই এবং সাধারণ প্রজার মধ্যে কোনো ভেদ রাখেন না। হৃদয় রক্তাক্ত হলেও লক্ষ্মণবর্জন করেছিলেন তিনি রাজধর্মের স্বার্থে।

আসলে যে জীবন, যে রাজধর্মের তিনি অনুসারী, সেটাই মানুষকে দেখায় প্রকৃত শান্তির পথ। নৈতিকতা ও আদর্শবোধে স্থিত হতে হলে, ভালো বন্ধু হতে চাইলে, ভালো ছেলে হতে হলে, ভালো বাবা, স্বামী হতে হলে আদর্শ শ্রীরামই। ভালো শাসক কিংবা বিচারক— তারও আদর্শ শ্রীরামই।

কূটতর্কে সর্বক্ষেত্রেই থাকে নানা বিরূপ-বিকৃতি ব্যাখ্যা। কিন্তু সত্যের পথ ধরে এগোলে দেখা যাবে সেরকই কেমন যেন অন্তঃসারহীন। বিকৃত মিথ্যার তমসা জাল বিছোলেও তা ভেদ করে প্রকাশিত হয় হিরণ্যদ্যুতি সূর্যই। আর সেই কারণেই যাঁরা মনে করেন বঙ্গদেশে শ্রীরাম বা শ্রীরামনবমী উৎসব চিরকালীন নয়— সাম্প্রতিকের উন্মাদনা, তাঁরা হয় অজ্ঞ কিংবা সবজেনেও অলীককল্পনা বিলাসী। নিজ স্বার্থেই মিথ্যা বেসাতির কারবারি।

উৎসব চিরন্তন :

যাঁরা মনে করেন রামনবমী উৎসব পালন অতি সাম্প্রতিকের ব্যাপার, তাঁদের জন্য একটি তথ্য, এই বঙ্গভূমে ঠাকুর-দেবতার নামে যেসব গ্রাম আছে তার সিংহভাগই রামনামযুক্ত, আর রামনবমী পালনও এক বহুকালীন উৎসব। ইতিহাসে না গিয়ে বরং একটি স্মৃতিচারণ।

যতদূর মনে পড়ে, এসব ১৯৪৮-৪৯ সালের কথা। স্থান তারকেশ্বর। মন্দির সংলগ্ন দুধপুকুরের পশ্চিমদিকে বেশ কয়েক বিঘে

জুড়ে এক ডাঙাভূমি। সমতলের চেয়ে ছ'সাত ফুট উঁচু তো হবেই। সম্ভবত দুধপুকুর কাটার মাটি ফেলার কারণেই ৪০/৪৫ গজ চওড়া ওই জমি। সেখানে প্রতি চৈত্রে রামনবমীতে হতো শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আর বিশ্বকল্যাণে যজ্ঞ। পূজা হতো চারদিন ধরে। তারকেশ্বর মঠের সবরকম উদার সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যেত। কিন্তু স্থানীয় মানুষই ছিল এই পূজার উদ্যোক্তা। ওই চারদিন আমাদের মতো বালক-বালিকাদের ওটাই ছিল সারাদিন, সন্ধ্যার ক্রীড়াঙ্গণ।

আজও মনে পড়ে, সম্ভবত পূজার একদিন দুপুরে হতো প্রায় সর্বজনীন এক ভোজের আয়োজন। পুরি, সবজি, পায়েস আর বোঁদে। সন্ধ্যায় আরতির পর নিত্য হতো প্রসাদ বিতরণ। সেটাও একদিক থেকে বিচিত্র। শীতলে দেওয়া হতো যে পুরি ভোগ, তাই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চিনি মাখিয়ে সকলকেই দেওয়া হতো সেই প্রসাদ। আর কোথাও প্রসাদ বিতরণের এমন রীতি আছে বলে ঠিক জানা নেই। রামনবমী পূজার কারণেই ওই উচ্চভূমির নামই হয়ে যায় অযোধ্যানগর।

মনে হতে পারে এটা তো তেমন সুদূর অতীতের কথা নয়। এর থেকে তো বোঝা যায় না যে শ্রীরাম বা রামকথার সঙ্গে বঙ্গের যোগটা বেশ পুরনো। সে কারণে তাকাতে হয় ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস বলে, কৃত্তিবাসের (১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ রচনার পরই বঙ্গে রামকাহিনি ও রামপূজার প্রাবল্য দেখা যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে বঙ্গের শ্রীরামপূজার শুরু। কথাটা পুরোপুরি মানার ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, কৃত্তিবাসের আগে থেকেই রামায়ণের একটা চল বঙ্গদেশে ছিল— এবং তারই মূল ধরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা। তাঁর এই রামায়ণ দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারই জেরে শ্রীরামের পূজা শুরু না হলেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বঙ্গদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই রামায়ণের কাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয়তার কারণেই বাংলাভাষায় রামায়ণের অনুবাদ এবং শ্রীরামকাহিনি নিয়ে কাব্যরচনার প্রতি ছিল অপার আগ্রহ। সেই আগ্রহের কারণেই বাংলাভাষায় লেখা হয়েছে কম-বেশি ১৩২টি রামায়ণ।

শ্রীচৈতন্যর প্রভাব :

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়াও এদেশে শ্রীরামকাহিনির প্রচার এবং রামপূজার বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা নেয় শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৪) প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন। তাই শ্রীরাম বহিরাগত এবং সাম্প্রতিককালেই কিছুটা রাজনৈতিক প্রয়োজনে রামনবমী পূজা— এমন মন্তব্যের পেছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকলেও প্রকৃত সত্য বা ইতিহাসের সমর্থন মেলে না।

ইতিহাসের পথ ধরে পেছন দিকে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, বঙ্গজীবনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মতোই শ্রীরামও জড়িয়ে আছে একবারে পরতে পরতে। আর সেকারণেই বাঙ্গালি রামময় বহুকাল ধরেই। তা যদি না হতো, শ্রীরাম-কথা যদি বাঙ্গালির পছন্দের তালিকায় না থাকত, তাহলে কি বঙ্গজীবনে রামকথার প্রভাব এভাবে পড়তে পারে?

যাঁরা বলেন, বঙ্গ হলো শক্তি সাধনার ক্ষেত্র, তাঁরা ভুলে যান বহু বর্ষ থেকেই বিশেষ করে মধ্যযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাবের পর, কেবল নবদ্বীপে নয়, সম্পূর্ণ বঙ্গভূমিতেই শক্তি সাধনার পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় ধারায় বইতে থাকে ভক্তিরসের প্রবাহ। বৈষ্ণবমতও হয়ে ওঠে বঙ্গের বৃহত্তর অংশের প্রাণের সাধনা।

এটা সকলেই জানেন, বৈষ্ণব মতের দু'টি ধারা— কৃষ্ণায়েত ও রামায়েত। কৃষ্ণ সাধনা প্রাধান্য পেলেও রামভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণন। সেটা যদি না হতো তাহলে বঙ্গের উচ্চকোটির সাহিত্যের পাশাপাশি লোকসাহিত্য এবং লোকজীবনের অবলম্বন কখনোই রামকথা হতে পারত না।

কেবল সাহিত্য নয়, বাঙ্গালির প্রতিদিনের জীবনের প্রায় প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে রামকথা কোনো না কোনো ভাবে। বঙ্গের স্থাননাম, ব্যক্তিনাম, লোকগান, পালাগান, যাত্রা, পুতুল নাচ থেকে সংস্কৃতির নামরূপে, মন্দির স্থাপত্যে সর্বত্রই রয়েছে শ্রীরাম। যদি বঙ্গজীবনে শ্রীরামের অস্তিত্বই না-থাকত তাহলে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অথবা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড নামের মধ্যে কেন ঘটল রামায়ণের অমন দিব্যপ্রকাশ! শ্রীরাম বহিরাগত হলে কি এমন সাংস্কৃতিক প্রকাশন আদৌ সম্ভব?

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শ্রীরামের এমন উজ্জ্বল উপস্থিতি ছাড়া নানা ধর্মাচার ও সাধনার ক্ষেত্রেও রয়েছে বহু সাধু -মহাপুরুষ এবং সেটা প্রাচীনকাল থেকেই। পারিবারিক ভাবেও রামসাধনার একটি ধারা রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, চণ্ডীদাস থেকে বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ অনেকেই ছিলেন 'পারিবারিকভাবে রামপূজক। আর এসবের নিরিখে কখনোই বলা যায় না, শ্রীরাম বঙ্গভূমিতে বহিরাগত।

নবরূপে আবির্ভাব :

পুরুষোত্তম শ্রীরাম। পাপভারে প্রপীড়িত ধরিত্রীমাতার আর্তিতে সাড়া দিয়ে দুষ্কৃতীদমন এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় নবরূপে আবির্ভূত হন ভগবান বিষ্ণু। শ্রীরামরূপে আবির্ভাব। এই নিয়ে সাতবার অবতীর্ণ তিনি এই ধরাধামে। শাস্ত্রমতে ও পুরাণকথায় ত্রেতাযুগে কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যায় তিনি দশরথ-নন্দন রাম নামে জন্ম নেন। জন্ম তাঁর চৈত্রের শুক্লানবমীতে তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে। কারও হিসেবে ১২টা পাঁচ, কাব্য মতে সাড়ে বারোটায় অযোধ্যার রাজপুরে বেজে উঠেছিল মঙ্গলশঙ্খ— এক শুভ বার্তা ছড়িয়ে দিতে। এসেছেন তিনি নররূপে মরলোকের সব পাপ-তাপ হরণে। শ্রীরামের নামেই তাঁর জন্মতিথি চিহ্নিত রামনবমী হিসেবে। ভারতীয় সংস্কারে পরম মঙ্গলময় ও কল্যাণকর এই দিন। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ বিশ্বের নানা জায়গায় দিনটি পালিত হয় নিজেকে ফিরে পাওয়ার এবং বিশ্বকে কলুষমুক্ত করার শপথ নেওয়ার পুণ্যক্ষণ হিসেবে।

পণ্ডিত ও গবেষকদের কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫১১৪ অব্দে, কেউ বলেন ৭১১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হন শ্রীরাম। ২০২৬-এর প্রায় গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলা যায়, সাত থেকে ন' হাজার বছরেরও বেশি আগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন শ্রীরাম। তাঁর এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল অশুভের সংহার, শুভের প্রতিষ্ঠা। কেবল ওই সময়ের জন্য নয়, ভবিষ্যতের মানুষের জন্য একটি সৎ ও সুন্দর জীবনের রূপরেখা নির্মাণও ছিল তাঁর এই অবতরণের উদ্দেশ্য। এবং সেকারণেই

রামনবমী কেবল ভারতীয় নয়, বিশ্বজীবনেরও এক অতি স্মরণীয় পুণ্যতিথি। এই দিনে নররূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র মানবজাতিকেই উপহার দিয়েছেন এমন একটি জীবনবোধ— যা চিরকালীন এক সত্যের প্রতীক।

তিনিই পরব্রহ্ম :

নরবপুচন্দ্রমা শ্রীরামচন্দ্রকে এই ভাবেই স্তুতি করা হয়। নররূপে নরলীলা করলেও তিনি পরব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান। সে অর্থে তিনি অজাত, সর্বব্যাপী ও অগোচর। সেই ব্রহ্ম-ই তাঁর সৃষ্টি বা ভক্তকল্যাণে মানবরূপ ধারণ করেন। মানবরূপ নিলেও তাঁর সাকার ও নিরাকার রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানবরূপ নিলেও তিনি অতীত। জড় জগতের কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

সাধকদের উপলব্ধি, মায়াতীত হলেও তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হন ভক্তদের আর্তিতে সাড়া দিয়ে। ভক্তদের প্রেমে আহ্লাদিত হয়ে তিনি ভুলে যান আপন ঈশ্বরত্বকে। শ্রীরাম অবতারে তাঁর মধ্যে দেখা যায়— সেই প্রেমলীলারই অলৌকিক প্রকাশ। প্রকৃত ভক্ত তাঁর সেই অলৌকিক লীলার রসাস্বাদন করতে পারলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু হয় বিভ্রান্ত।

সংশয় ভবানীরও :

এই যে বিভ্রান্তি এটা কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে না, যাঁরা স্বয়ং ভগবান তাঁদের মধ্যেও ঘটে। সীতা বিরহে কাতর রামচন্দ্রকে দেখে সংশয় দেখা দেয় স্বয়ং ভবানীর মনে। তাঁর প্রশ্ন, রাম যদি ঈশ্বরই হয়, তাহলে পত্নীবিরহে সাধারণ মানুষের মতো এমন কাতর হচ্ছেন কেন তিনি? তবে কি রাম সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যায় তা সব সত্য নয়? এই সংশয় থেকেই দেবী মহেশ্বরীর মধ্যে জাগল পরীক্ষা করে দেখার বাসনা। সেই বাসনা মূর্ত করতে গিয়েই দেবী আবার সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করলেন— ভঙ্গ হবে, বিশ্বাসও করবে, কিন্তু যাচাই করতে ছাড়বে না। কারণ তার মধ্য দিয়েই ঘটে প্রকৃত সত্যদর্শন।

দেবী মহামায়া সেদিন দেবী সীতার রূপ নিয়ে সেই অরণ্যে আবির্ভূত হলেন রামের সামনে। পলকেই স্পষ্ট হলো সব। দেবীকে প্রণাম করে রাম জানতে চান— মা, আপনি এই গহীন অরণ্যে কী করছেন? আমার পিতা মহেশ্বর কোথায়?

ধরা পড়ে যান মহাদেবী। তাই আর কোনো কথা না বলে লজ্জায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যান শিবালয়ে মহাদেবের কাছে। এটাই হলো অবতার পুরুষের লীলার বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ঈশ্বর 'রামচন্দ্র' রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই মনুষ্যলোকে। বহুক্ষেত্রে তাঁর আচরণ সাধারণ মানুষের মতো হলেও তিনিই যে সেই পরব্রহ্ম তা বোঝা যায় একটু নিবিষ্ট হলেই।

রামায়ণ জীবনবেদ :

নানা দিক থেকেই শ্রীরাম বা তাঁর জীবনকথা রামায়ণ হলো একটি জীবনবেদ। সেই বেদের সার কথা, 'আমি' থেকে 'আমরা'য় উত্তরণ। 'আমি'র মধ্যে রয়েছে অহংবোধ— রয়েছে তার মধ্যে অহংকারের প্রকাশ, আর 'আমরা'র মধ্যে আছে সমদর্শন। শ্রীরাম জগৎকে দিয়েছেন সকলকে সমানভাবে দেখার শিক্ষা। সকলের মধ্যে নিজেকে দেখাই হলো রামকথার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামের প্রতিটি কাজের মধ্যেই রয়েছে কোনো না কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার একটি ব্যাপার। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনবাসে গিয়ে শ্রীরাম শেখালেন— বাবা-মাকে শ্রদ্ধা বা ভালোবাসতে হবে শর্তহীন ভাবে। শর্তের অর্থই হলো অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাসের মূল কেটে দেওয়ার কথাই আছে রাম-কথায়।

শ্রীরামের বনবাসে যাওয়ার সঙ্গী হয়ে সীতা প্রমাণ করলেন বিবাহবন্ধনের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের মূল্যবোধ। মূল্যবোধহীন জীবনে আর যাই থাক— থাকে না সুখ-শান্তি। জীবনের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া সুখ আর শান্তি। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের বনগমনের সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে চরম সংকটের মুখেও পরিবারের সকলের একসঙ্গে থাকা। ভরতের রাজ্য প্রত্যাখ্যান শিক্ষা দেয় উপনিষদের সেই সত্য— সুখ ভোগে নয়, ত্যাগে।

রামায়ণে কেবল আলো নয়, আছে অন্ধকারের কথা, সেই অন্ধকারের শেষপ্রান্তে অবস্থান রাবণের। শক্তি, অর্থ এবং আরও অনেক কিছুর অধিকারী হয়েও রাবণের পতন হয়। আর এটাই অধর্মাচরণের শেষ পরিণতি।

স্বার্থপরতার ক্ষণিক মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কৈকেয়ী যা করেন তার জন্য সবপেয়েও জীবনভর ঘর করেন পাপবোধ ও অনুশোচনার সঙ্গে। স্বার্থপরদের কাছে এটা হলো এক বিরাট হুঁশিয়ারি। একইভাবে বালিবধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ, হঠকারিতা এবং ক্ষণেকের ক্রোধ শেষে ডেকে আনে মৃত্যুকেই। এইভাবে অগ্রসর হলে দেখা যাবে শ্রীরামের জীবনকথা মানুষের জীবনযাপন শিক্ষার একটি 'বর্ণপরিচয়'। রামকথা বা রামায়ণের এইসব বৈশিষ্ট্য দেখেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক এএ ম্যাকডোনেল মন্তব্য করেছেন, 'সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের অন্য কোনো রচনায় মানুষের জীবন ও মননের এমন গভীর প্রভাব দেখা যায় না।'

রামরাজ্যের স্বরূপ :

শ্রীরামের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে রামরাজ্যের কথা। রামরাজ্য কোনো নির্দিষ্ট রাজ্য বা ভূখণ্ড নয়, এটি হলো আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার একটি পরম প্রকাশ। রামরাজ্যের রাজা রাম কোনো শাসক নন, তিনি একজন মানুষ। সন্তান হিসেবে, স্বামী হিসেবে, ভাই-বন্ধু হিসেবে তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব। তাঁর রাজ্যপালনের মধ্যে কেবল শাসকের শাসন নয়, আছে সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় বোধের সম্মিলিত প্রকাশ। রামরাজ্যের আদর্শ বা কামনা— সকলের সুখ ও শান্তি।

রামরাজ্যে শাসক কখনোই পরের কথায় সবকিছু দেখেন না। নিজে প্রত্যক্ষ করেই নেন চূড়ান্ত ব্যবস্থা। সত্য ও ধর্ম হলো রামরাজ্যের দুই মূল স্তম্ভ। মানব কল্যাণ হলো রামরাজ্যের একমাত্র ধর্ম। ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ নয়, অন্যের সুখের জন্য আত্মনিবেদনেই পূর্ণতা পায় এই রামের ধারণা। সাম্য ও ন্যায় বিচার এই রাজ্যের শাসকের একমাত্র সাধনা। রামরাজ্য চায়, শাসনের কাজে মানুষের সক্রিয় উপস্থিতি। আর শেষের কথা, অনুকরণ নয়, অনুসরণ— এটাই হলো রামরাজ্য রামায়ণের অভিপ্সা। ■

রামরাজাতলা শঙ্করমঠে মাতৃশক্তি সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সামাজিক সমরসতা, সদ্ভাবনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবার প্রবোধন ও নাগরিক কর্তব্য বিষয়ে সচেতনতা জাগরণের উদ্দেশ্যে গত ৭ মার্চ হাওড়া মহানগরের রামরাজাতলা শঙ্করমঠের সভাগৃহে এক মাতৃশক্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমতী বিউটি বসু। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণধর্ম সঙ্ঘের প্রব্রাজিকা সাধ্বী আত্মকামপ্রাণা মাতাজী। এছাড়াও মঞ্চাসীন ছিলেন সঙ্ঘের হাওড়া মহানগর সঙ্ঘচালক সঞ্জয় বসু এবং দক্ষিণবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ সুনীল সিংহ।

প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন মন্ত্র ও শিবস্তোত্রম্ আবৃত্তি করেন 'সৌন্দর্য লহরী'র মাতা-ভগ্নীরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সভানেত্রী শ্রীমতী বিউটি বসু। এরপরে সামাজিক সমরসতা, সদ্ভাবনা, পরিবার প্রবোধন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নাগরিক কর্তব্যবোধ বিষয়ে মাতৃশক্তির দায়িত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, তৎসহ পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনে মাতৃশক্তির ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রধান বক্তা অদ্বৈতচরণ দত্ত। প্রব্রাজিকা সাধ্বী আত্মকামপ্রাণা মাতাজী প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত মাতৃমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করেন। সম্মেলনে এলাকার বহু মাতা-ভগ্নী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেনের আহ্বায়িকা তথা হাওড়া মহানগরের মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী ধীশ্বরী নাগ। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সংস্কার ভারতী হাওড়া মহানগর শাখার মাতৃমণ্ডলীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গীতের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

মালদহের গাজোলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব

গত ৭ ও ৮ মার্চ মালদহ জেলার গাজোলে ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষ দিনে হিন্দুধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মণ, মালদহের বিধায়ক গোপাল সাহা, হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু। এছাড়াও এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মালদহের গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিজয় ঘোষ, প্রাক্তন সৈনিক সঞ্জিত মিশ্র। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালুরঘাট আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী মহারাজ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দান করেন। এই সম্মেলনের আগে বীরশ্রেষ্ঠ লাঠি খেলা প্রদর্শনী হয়। এই খেলা পরিচালনা করেন গোবিন্দচন্দ্র সরকার। সবশেষে বীরদর্পে গুরু মহারাজের সন্ধ্যারতি ও বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগরাশি বিতরণ নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতির

সিউড়ী তথা বীরভূম জেলার একজন আদর্শ শিক্ষক, প্রকৃত মানব প্রেমিক ও সমাজসেবক হলেন নিরঞ্জন হালদার, যিনি 'ছোড়দা' নামেই ছিলেন বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন সিউড়ীর প্রণবানন্দ আদর্শ পাঠমন্দিরের শিক্ষক ও বীরভূম জেলার প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আচার্য এবং জেলার 'শ্রদ্ধা' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। জীবিতকালে তিনি অসংখ্য মানুষের উপকার করেছেন, আবার তাঁর প্রয়াণের পরও তাঁর গচ্ছিত অর্থের সুদ থেকে গত পাঁচ বছর ধরে দুঃস্থ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছে 'স্বর্গীয় নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতি'। গত ৮ মার্চ সিউড়ী অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে ছোড়দার জন্মমাস পালন হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সমিতির প্রবীণ সদস্য তথা 'শ্রদ্ধা' সংস্থার বর্তমান সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। এরপর ছোড়দার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন 'শ্রদ্ধা' সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস, শিক্ষক পরিতোষ হাজরা-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। ছোড়দার স্মৃতিচারণ করেন উজ্জ্বল নায়ক, মানব রায়, প্রধান

আচার্য নির্মল ঠাকুর এবং শিশুমন্দিরের জেলা সমিতির প্রমুখ বিশ্বনাথ দে। কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন ছোড়দার গুণগ্রাহী তথা শিক্ষানুরাগী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুব্রত নন্দন, মালা দাস এবং চন্দ্রা ও মল্লিকা দিদিভাই। সিউড়ীর চারটি সরস্বতী শিশুমন্দির, 'শ্রদ্ধা', কল্যাণ আশ্রম ও লোকপ্রজ্ঞা সংস্থাকে এবং একজন দুঃস্থ মেয়ের বিয়েতে সহযোগ রাশি তুলে দেন সমিতির অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত মাহান্ত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর রাষ্ট্রবন্দনার মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

হাওড়া শহরে দোলপূর্ণিমায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে নগর সংকীর্তন

প্রতিবছরের মতো এ বছরও দোলপূর্ণিমায় হাওড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে নগর সংকীর্তন কেশব নগরের (মধ্য হাওড়ার) বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। গত ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত এবারের নগর সংকীর্তন ৫১তম বর্ষে পদার্পণ করল। নগর সংকীর্তনে শিশুদের রাধা-কৃষ্ণ সাজানো-সহ পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার মা-বোনেরা এবং সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা দু'টি ট্যাবলোতে কীর্তন করে এই নগর সংকীর্তনকে বর্ণাঢ্য করে তোলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাওড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক উপেন্দ্র রাই এবং দুর্গাবাহিনীর ক্ষেত্রীয় সংযোজিকা ঋতু সিংহ-সহ প্রায় ২০০ জনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত এই নগর সংকীর্তন মধ্য হাওড়ায় বিশেষ সাড়া ফেলে দেয়।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

মানিকতলায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ৮ মার্চ হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সকল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তাদের একটি বিশেষ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উত্তর কলকাতায় মানিকতলা পোস্ট অফিসের পাশে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যালয়ে 'মিলন-২০২৬'-শীর্ষক এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের পর দেবী সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ নায়েক, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেসের অধ্যাপক ড. মনোরঞ্জন রায়, বিদ্যার্থী বিকাশ ট্রাস্টের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু বক্সী এবং বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা মণীন্দ্র করণ। পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তাদের সমাগমে এদিন সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। পূর্বতন কার্যকর্তাদের সকলের পরিচয়পর্বের শেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা। এদিনের সম্মেলনে সকলেই পুরোনো দিনের কথা, সেই সময়ের সাংগঠনিক পরিস্থিতি এবং জ্ঞান-চরিত্র একতা-র আদর্শকে পাথেয় করে জেলা, বিভাগ ও প্রদেশ স্তরে বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত বিষয়ক আলোচনা ও স্মৃতি রোমন্থন করেন। সম্মেলনটি আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করেন পরিষদের পূর্বক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল।

এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা অভিজিৎ বিশ্বাস। সম্মেলনের শেষে পরিষদের পূর্বতন ও বর্তমান কার্যকর্তারা সহ-ভোজনে মিলিত হন।

প্রেস ক্লাবে 'উইমেন্স অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস্, ২০২৬ (সিজন্-৩)' প্রদান

গত ৮ মার্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'ইন্টারন্যাশনাল ইক্যুইটেবল্ হিউম্যান রাইটস্ সোশ্যাল কাউন্সিল'-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় ন্যাশনাল উইমেন কনক্লেভ এবং 'উইমেন্স অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস্, ২০২৬ (সিজন্-৩)' পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বিভাগে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিল্পোদ্যোগ, বিনোদন ও কোম্পানি বিষয়ক ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা মহিলারা ছাড়াও বিশিষ্ট লেখিকা, শিল্পী, সমাজসেবী, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা-সহ সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের কৃতী মহিলাদের সম্মানিত করার একটি মাধ্যম হলো এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী শিপ্রা দত্ত, ভরতনাট্যম শিল্পী রূপা কর, কলকাতার সরশুনা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. প্রশস্তি ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সঞ্চালিকা তাপসী রায় নন্দন প্রমুখ বিশিষ্টজনদের এদিন সংস্থাটির পক্ষ থেকে সমাজে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার আন্তর্জাতিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় সিনহা ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন ডুকপা। তাঁরা বলেন যে, বিশিষ্টজনদের সম্মানিত করার মধ্যে দিয়ে সংস্থার গৌরব বৃদ্ধি ঘটেছে। উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি ও পুরস্কার-প্রাপিকারা তাঁদের বক্তব্যে নিজেদের কাজ ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরেন।

বসিরহাটে নেতাজী গবেষকদের বিতর্ক সভা

সন্ন্যাসী ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রামাণ্য ইতিকথা আজ একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের ঘৃণ্য চক্রান্তে ধূসর। ভারতীয় জনগণের সামনে আজও সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি তাঁদের প্রিয় নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য। গত ৮ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে টাউন হলে 'সন্ন্যাসী দেশনায়ক : এ ফোরাম ফর সোশ্যাল চেঞ্জ'-এর আয়োজন ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়— 'মেটামরফোসিস না গুমনামী প্রবঞ্চনা?'-শীর্ষক একটি বিতর্ক সভা। এদিনের অনুষ্ঠান ছিল দু'টি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বটি ছিল 'বিতর্ক বিতান'। এই পর্বে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. জয়ন্ত চৌধুরী, শুভাশিস চৌধুরী, সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি ঘোষণা-সহ ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর মিথ্যা গল্প সরকারিভাবে বাতিলের দাবি এদিন বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উত্থাপিত হয়। ওয়েব সিরিজ 'প্রলয়-২'তে নেতাজীর নাম উচ্চারণ করে অপমানের প্রতিবাদও এদিন সভামঞ্চ থেকে করা হয়। সমাজের সর্বস্তরে এই প্রতিবাদ ওঠা অত্যন্ত জরুরি বলে সকলেই মতপ্রকাশ করেন। বিতর্ক সভাটি সঞ্চালনা করেন নেতাজী গবেষক ও চলচ্চিত্র পরিচালক অম্লানকুসুম ঘোষ। দ্বিতীয় পর্বটি ছিল 'তথ্য-প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা'। বিতর্ক সভার দ্বিতীয়ার্ধে এই পর্বে সভাগৃহে প্রদর্শিত হয় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধান এবং ভারতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রামাণ্য দলিল রূপে নির্মিত তথ্যচিত্র— 'ব্ল্যাক বক্স অফ হিস্ট্রি'। উল্লেখ্য, এই তথ্যচিত্র নির্মাণকালীন ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সমকালীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসদ, নেতাজী রহস্য উন্মোচনে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক উপলব্ধি। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় এই তথ্যচিত্রে পরিচালক অম্লানকুসুম ঘোষকে নির্দ্বিধায় বলেন যে, তিনি ১০০ শতাংশ বিশ্বাস করেন, অযোধ্যার গুমনামী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীভগবানজীই ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র 'ব্ল্যাক বক্স অফ হিস্ট্রি' বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের সেই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি সংবলিত হওয়ার কারণে এক সময় নানা মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। উৎসাহী দর্শকের ভিড়ে এদিন সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ ও বাদুড়িয়া অঞ্চল থেকে অনেকে সভায় আসেন।

ভবানীপুরে আরোগ্য ভারতীর একদিবসীয় কর্মশালা

গত ১ মার্চ কলকাতার ভবানীপুর-স্থিত একল ভবনে আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে গর্ভসংস্কার বিষয়ক একদিন-ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি জয়ন্ত সেন। এই কর্মশালায় মোট ৮৬ জন গর্ভবতী মা, অভিভাবক এবং এই বিষয়টিতে আগ্রহী বহু মানুষ উৎসাহের সঙ্গে এদিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার প্রধান বক্তা ছিলেন অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদিক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, লেখক ও স্বাস্থ্যসচেতনতা প্রচারক ডাঃ মধুরা কুলকার্নি, যিনি গর্ভসংস্কার ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছেন। অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি গর্ভসংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন যে, গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তাভাবনা, মানসিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডাঃ কুলকার্নি আরও বলেন

যে, ইতিবাচক চিন্তা, শান্ত সঙ্গীত শোনা, ধ্যান, যোগব্যায়াম এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গর্ভস্থ শিশুর সুস্থ বিকাশে সহায়ক। তিনি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে গর্ভসংস্কারের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গর্ভসংস্কারের গুরুত্বের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। দিনভর চলা এই কর্মশালায় ছিল আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং কিছু ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এতে অংশ নেন এবং তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তরও পান। আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালার মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় সঠিক মানসিক ও শারীরিক পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

গত ১৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সরকারি ও সরকার-পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে একদিনের ধর্মঘট পালন করেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ১০ বছরের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান বিষয়ে রাজ্য সরকারের বঞ্চনা ও প্রতারণা, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ ও ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদান, রাজ্য সরকারের ৬ লক্ষ শূন্যপদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিয়োগ, যোগ্য অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিটেলমেন্ট ও প্রতিহিংসামূলক বদলি বন্ধের দাবিতে এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের দীর্ঘস্থায়ী বঞ্চনা ও প্রতারণার প্রতিবাদে ডাকা ধর্মঘটে এদিন অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ। রাজ্য কর্মচারী সংগঠনগুলির বৃহত্তর আন্দোলন মঞ্চ— 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ' ও 'যৌথ মঞ্চ'-এর মিলিত আহ্বানে এদিন রাজ্য জুড়ে সরকারি অফিস, আদালত, পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধর্মঘট হয়, যেখানে বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এদিনের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল— পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) এবং বিএমএস-অনুমোদিত বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনগুলির। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারি-সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সারাদিন ব্যাপী এই ধর্মঘটে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে স্বস্তিকা পাঠক সম্মেলন

গত ১৪ মার্চ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া স্থিত তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি তাপস ভট্টাচার্য, পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং পত্রিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। সম্মেলনে শিশু মন্দিরের আচার্য-আচার্যা-সহ ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন শ্রীভট্টাচার্য। প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল স্বস্তিকা পত্রিকার সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে সমাজজীবনে তার জনমত গঠনে ৭৮ বছরের নিরবচ্ছিন্ন যাত্রার কথা উল্লেখ করেন। এরপর পাঠক-পাঠিকারা পত্রিকা বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল বঙ্গমানস নির্মাণে স্বস্তিকা পত্রিকার ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শান্তিমন্ত্র উচ্চরণের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রীয় সামাজিক গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখ্য কার্যালয়ে গত ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ মহারাজ, ভারতের সহকারী সলিসিটর জেনারেল তথা কলকাতা উচ্চ আদালতের আইনজীবী অশোক কুমার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের পঞ্চমপুরুষ জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য আয়োজক ছিলেন অ্যাডভোকেট রণজয় চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বহু গুণী ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতীয় নারীর আদর্শ

জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী দময়ন্তী

সুতপা বসাক ভড়

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশমন্ত্রে বলেছেন, 'হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী...'। ভারতবর্ষের নারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান ছিল, এইসকল মহামানবীদের জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে, সেইমতো নিজ-নিজ জীবন চালনা করা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সুসংগঠিত করার জন্য সর্বদা প্রয়োজন সশক্ত, জ্ঞানী, প্রত্যুৎপন্নমতি, আত্মোৎসর্গে নিয়োজিত মাতৃশক্তির। তাঁদের জীবনী সম্পর্কে বার বার আলোচনা করতে থাকলে, আমরা বুঝতে পারব যে, বিধির বিধানে অতীতে অনেক বিড়াম্বনার সম্মুখীন হতে বাধ্য হলেও, নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য অবশেষে তাঁরা প্রত্যেকে সমাজের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ জীবকুল; তবু এরই মধ্যে আমরা কেবলমাত্র তাঁদেরই স্মরণ করি, যাঁরা তাঁদের কর্মের দ্বারা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন দময়ন্তী। যিনি নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, প্রেম, বাস্তবজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা জীবনযুদ্ধে হয়েছিলেন বিজয়িনী। বর্তমানেও মহিলাদের জীবনে বিভিন্ন প্রকার জটিলতা আছে, সেগুলি অতিক্রম করে কীভাবে এগিয়ে চলা যায় তার উদাহরণ আমরা পেয়ে যাই দময়ন্তীর চরিত্র অনুধাবনে।

বিদর্ভের রাজা ছিলেন ভীম। বীর ও প্রজাপালনকারী রূপে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁর ছিল তিন পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক অপরিসীম গুণবতী ও রূপবতী কন্যা। সেময় নিষাদ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন নল। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ, রথচালনায় নিপুণ এক সুপুরুষ। সেসময় তাঁর নাম-যশের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন দ্যূতক্রীড়া আসক্ত— যা ছিল তাঁর চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা।

এদিকে রাজকন্যা দময়ন্তীর বিবাহের জন্য তাঁর পিতা রাজা ভীম উদ্যোগ নিলেন, অপরদিকে রাজা নলেরও বিবাহের জন্য সুপাত্রীর খোঁজখবর নেওয়া শুরু হলো। দূতমুখে পরস্পরের গুণাগুণ শুনে নল ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। একদিন রাজা নলের উদ্যানে এক ঝাঁক সুবর্ণ-পালক বিশিষ্ট রাজহাঁস নেমে আসে। রাজা তাদের মধ্যে একটি রাজহাঁসকে মারতে উদ্যত হলে, ওই রাজহাঁসটি নলের মনের কথা জানতে পেরে মনুষ্যকণ্ঠে বলে ওঠে যে সে দময়ন্তীর কাছে তাঁর কথা এমনভাবে ব্যক্ত করবে যে, সে কেবলমাত্র রাজা নলকেই বিবাহ করতে চাইবে।

যথাসময়ে রাজহাঁসটি তার দলের সঙ্গে রাজকন্যা দময়ন্তীর কাছে পৌঁছে রাজা নলের সম্পর্কে জানায়। এরপর দময়ন্তী নলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এদিকে তাঁর বাবা রাজা ভীম স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। ওই স্বয়ংবর সভায় নানা রাজ্যের রাজপুত্র, রাজা, এমনকী দেবতারাও এসে যোগ দেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, অগ্নি ও বরুণদেবতা আগমন করেন নলকে একটি বিশেষ উপকার করার জন্য অনুরোধ করেন। নল স্বীকৃত হলে তাঁরা বলেন যে, নল যেন দময়ন্তীকে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি তাঁদের চারজনের মধ্যে একজনকে স্বয়ংবর সভায় পতিরূপে বরণ করে নেন। সত্যনিষ্ঠ নল দেবতাদের সহায়তায় দময়ন্তীর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে দেবতাদের অনুরোধ জানান।

দময়ন্তী দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে নলকে বলেন যে, তিনি তাঁর সর্বস্ব নলকেই নিবেদন করেছেন। তিনি নলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তিনি একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে সকল রাজপুত্র, রাজা এবং দেবতাদের সামনে নলকেই স্বামীরূপে বরণ করবেন।

স্বয়ংবর সভায় এসে দেখেন যে, পাঁচজন নল--- সকলেই একরকম। বুদ্ধিমতী দময়ন্তী বুঝতে পারলেন যে এঁদের মধ্যে চারজন দেবতা, যাঁরা তাঁর পাণিগ্রাহী হয়ে এসেছেন। তিনি তখন করজোড়ে দেবতাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে জানান যে, রাজহংসের মুখে নলের কথা শুনে, তাঁকেই তিনি স্বামীরূপে মেনে নিয়েছেন। তিনি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে বলেন— তাঁরা যেন তাঁর সতীত্ব রক্ষার জন্য এবং তিনি যাতে দ্বিচারিণী না হন সেজন্য সাহায্য করেন।

অবশ্য রাজকুমারী দময়ন্তী দেখে নিয়েছেন যে, পাঁচজন নলের মধ্যে

চারজন ভূমি স্পর্শ না করেই দাঁড়িয়ে আছেন। কৃতজ্ঞতা ভরে দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে অগ্রসর হয়ে রাজা নলকে বরমাল্য পরিয়ে দেন। বিবাহের পরবর্তী কয়েকবছর তাঁরা সুখে শান্তিতেই ছিলেন, কিন্তু কলির কুপ্রভাবে নল তাঁর ভাই পুষ্করের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। পাশাখেলায় মত্ত হয়ে তিনি নিজ রাজ-কর্তব্য, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হলেন এবং ধন-সম্পদ সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হলেন। দময়ন্তী স্বামীকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেন, অবশেষে পরিস্থিতি বিরূপ দেখে তিনি তাঁদের পুত্র-কন্যাদের নিজ পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেন। এদিকে দুষ্ট পুষ্কর যখন দময়ন্তীকে পাশায় বাজি রাখার প্রস্তাব দেয়, তখন নলের মোহভঙ্গ হয়। তিনি একবস্ত্রে রাজপ্রাসাদ, রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে চলে যান।

দময়ন্তী স্বামীর অনুগামিনী হয়ে অরণ্যের পথে চলতে থাকেন। হঠাৎ নল একঝাঁক সোনার পালকবিশিষ্ট পাখি দেখতে পান। ক্ষুধায় কাতর, ধনহীন নল দময়ন্তীর নিষেধ অবজ্ঞা করে সোনার পালকের লোভে নিজের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রটি পাখিগুলির ওপর নিক্ষেপ করলেন। পাখিগুলি বস্ত্রসহ নিমেষে উড়ে গেল। বিবস্ত্র নল বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

দময়ন্তী তখন নিজ পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেক ছিঁড়ে নলকে দেন এবং তাঁর বাবা রাজা ভীমের কাছে যাওয়ার জন্য বলেন। নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য সর্বহারা নল লজ্জিত ও অসম্মত হলেন, কিন্তু কলির প্রভাবে রাত্রে গভীর অরণ্যে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল চলে যান।

ঘুম ভেঙে দময়ন্তী নির্জন অরণ্যে ওই অবস্থায় নিজের এবং নলের জন্য দুশ্চিন্তায় আকুল হলেন। দীর্ঘসময় পথ অতিক্রম করে একটি আশ্রমে এসে পৌঁছালেন। সেখানে মুনি-ঋষিদের সকল কথা জানালেন। তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে আশ্বাস দেন যে শীঘ্রই তিনি তাঁর মাতা-পিতা, স্বামী সন্তানাদির সঙ্গে মিলিত হবেন।

এবার দময়ন্তী অরণ্যের শেষে একটি প্রশস্ত রাজপথ ধরে চলতে থাকেন। সেটি ছিল চেদি নগর। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, উন্মাদিনীপ্রায় দময়ন্তীকে দেখে দয়াময়ী চেদি রাজমহিষী পরিচারিকার মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠান। রানিকে নিজের জীবনের করুণ কাহিনি জানালেও তিনি তাঁর নাম প্রকাশ করেননি।

রাজা নল একের পর এক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি একজন বামন মানুষে পরিবর্তিত হন। তবে, দ্রুত রথ চালনার দক্ষতা তাঁর স্মরণে ছিল। অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে তিনি সারথীর কাজ গ্রহণ করেন।

দময়ন্তীর পিতা রাজা ভীম তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের কোনো সংবাদ না পেয়ে চর্তুদিকে ব্রাহ্মণ দূতদের পাঠাতে থাকেন এবং ঘোষণা করেন যে তাঁদের সন্ধান দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এদের মধ্যে দময়ন্তীর ভাইয়ের বন্ধু সুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ চেদি নগরে এসে দময়ন্তীকে দেখেন। চেদির মহারানি ছিলেন তাঁর মাসি। দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে দময়ন্তী খুবই আনন্দিত হলেন। মাসিকে প্রণাম জানিয়ে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি চেদি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে পিতৃগৃহের উদ্দেশে রওনা হলেন।

পিতৃগৃহে এসে মা-বাবা, সন্তানাদির সঙ্গে মিলিত হয়েই তিনি স্বামীকে খুঁজে বের করতে প্রবৃত্ত হলেন। কয়েকটি শ্লোক রচনা করে দূতেদের তা আবৃত্তি করার জন্য শিখিয়ে দেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে পাঠান। তিনি তাঁদের বলে দেন যে, তাঁরা যেন দময়ন্তীর কথা কাউকে না বলেন। কেউ ওই শ্লোকগুলির উত্তর দিলে তা যেন সংগ্রহ করে আনেন।

দূতেরা দূর দেশে গিয়ে দময়ন্তীর নির্দেশ মতো ওই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতে থাকেন। দময়ন্তী তাঁর স্বামীর উত্তরের অপেক্ষায় এবং তাঁকে খুঁজে বের করার কাজে প্রচেষ্ট থাকেন। অবশেষে পর্ণাদ নামক একজন ব্রাহ্মণ সুদূর অযোধ্যা থেকে এসে দময়ন্তীকে জানান যে, রাজার সারথী বাহুক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁকে কিছু কথা বলেন। সেই প্রত্যুত্তর শুনে দময়ন্তী নিশ্চিন্ত হলেন যে ওই বাহুক-ই হলেন তাঁর স্বামী নল।

তিনি তাঁর ভাইয়ের মিত্র সুদেবকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণকে অনুরোধ জানান যে, আগামীকাল সকালে দময়ন্তীর জন্য পুনরায় স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়েছে। দময়ন্তীর রূপ-গুণের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেজন্য সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পত্নীরূপে পাবার জন্য রাজা ঋতুপর্ণ, তাঁর সারথি বাহুককে নিয়ে স্বয়ংবর সভায় আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাহুক রাজার আদেশ পালন করে। তার রথ চালনার দক্ষতায় রাজা মুগ্ধ হন এবং তাঁর কাছে রথচালনা ও অশ্বপরিচর্যা বিদ্যালাভ করার আগ্রহ করেন, বিনিময়ে তিনি বাহুককে পাশাখেলা শেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। পাশাখেলায় রাজা ঋতুপর্ণের বিশেষ দক্ষতা ছিল।

বিদর্ভে এসে তাঁরা স্বয়ংবর সভার কোনো আয়োজন না দেখে বিস্মিত হলেও দময়ন্তী বুঝলেন যে নল ছাড়া আর কেউ এত দ্রুত এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পারে না। তিনি সন্তানদের বাহুকের কাছে পাঠিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন। বাহুকের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন, তিনিই নল। যিনি পরিচারিকার মাধ্যমে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন। এরপর মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে বাহুকের সঙ্গে কথা বলে সম্পূর্ণভাবে দ্বিধামুক্ত হলেন। নল জানতে চান দময়ন্তী স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছেন, অথচ এখানে কোনো আয়োজন নেই। দময়ন্তী জানান, এটি তাঁর কৌশল, কারণ কেবলমাত্র নলই দ্রুত অশ্বচালনা করে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভ আসতে পারেন। সেজন্য একমাত্র অযোধ্যার নৃপতির কাছেই আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে।

নল জানান, কীভাবে কলির এভাবে তাঁর এমন দুর্মতি হয়েছিল। নল-দময়ন্তীর পুর্নমিলন হয়। নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পান। পাশা খেলায় দক্ষ নল পাশা খেলায় জয়লাভ করে ভাই পুষ্করের থেকে হারানো সবকিছু উদ্ধার করেন। রাজা নল, রানি দময়ন্তী পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

দময়ন্তী সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সকল বিষম পরিস্থিতি অতিক্রম করে স্বামীকে খুঁজে বের করেন। বর্তমান যুগেও মহিলাদের সামনে অনেক অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা আছে; তাঁরা যদি দময়ন্তীর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন, তাহলে তাঁরাও জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী হবেন। স্বদেশমন্ত্রে স্বামীজী এই মহীয়সী নারীর নাম নিয়েছেন আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য, আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। □

মানবোন্নতির পথে

পর্ব ৪

‘আমিত্ব’-বোধই সমস্ত বন্ধনের শৃঙ্খল

অনামিক রায়

মানুষ ইন্দ্রিয়সাধিত জীব। সংসারে অবস্থান করে কর্তব্য পালন করতে হলে তাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম করতে হয়। চোখ দেখবে, কান শুনবে, মন চিন্তা করবে; এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এড়াবার কোনো উপায় নেই। তাই বিষয়চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা সংসারযোগীর পক্ষে না সম্ভব, না প্রয়োজনীয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা নিষেধ করেছেন, তা বিষয়চিন্তা নয়; তিনি নিষেধ করেছেন বিষয়কে সুখের একমাত্র উৎস বলে কল্পনা করে তাতে চিত্তকে বারংবার নিমগ্ন করতে। এই নিমগ্নতাই আসক্তির জন্ম দেয়, আর আসক্তিই সাধকের পতনের প্রথম সোপান।

আসক্তির স্বভাবই তৃপ্তিহীনতা। যা একবার লাভ হয়, তাতেই সে থামে না; বরং সেই লাভ হতেই জন্ম নেয়, ‘‘আরও হোক, আরও চাই’’ —এই অন্তহীন কামনার প্রবাহ। কামনা কেবল কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ নয়; এটি এক গভীর মানসিক বিভ্রম, যেখানে মানুষ কোনো বিশেষ বস্তু বা অবস্থাকেই নিজের সুখ ও পূর্ণতার অপরিহার্য শর্ত বলে ভাবতে শুরু করে।

যতক্ষণ এই কামনার পূর্ণতার পথে কোনো বাধা উপস্থিত হয় না, ততক্ষণ চিত্ত উত্তেজিত ও অস্থির থাকলেও মানুষ মনে করে সে নিজের নিয়ন্ত্রণেই আছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে পরিস্থিতি, ব্যক্তি কিংবা ভাগ্যের দ্বারা কামনা পূর্ণ হবার পথে প্রতিকূলতা ঘটে, সেই মুহূর্তেই এই উত্তেজনা রূপান্তরিত হয় ক্রোধে।

এই ক্রোধ সাধারণ রাগমাত্র নয়; এটা চেতনার এক গভীর অন্তর্দাহ। শাস্ত্র এই ক্রোধকে অগ্নিমিশ্রিত ধূমের সঙ্গে তুলনা করেছে; যেমন ধোঁয়া আগুনের আলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তেমনি ক্রোধ বিবেকশক্তির দীপ্তিকে ঢেকে দেয়। তখন সাধক কী করবে, কী করবে না— এই সূক্ষ্ম কর্তব্যবোধ আর কার্যকর থাকে না।

কর্ম তখন বিবেকের নির্দেশে নয়, বরং উত্তেজিত প্রবৃত্তির টানে সম্পন্ন হয়। এই অবস্থাতেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে; সে ভাবে সে সচেতনভাবেই কাজ করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজের চেতনা হতেই বিচ্যুত হয়ে যায়।

ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা থেকেই মোহ উৎপন্ন ঘটে। মোহ মানে কেবল অজ্ঞানতা নয়; মোহ মানে সত্য যেমন আছে তেমনভাবে দেখবার শক্তির লোপ। চেতনা তখন বাস্তবকে কামনা ও ক্রোধের রঙে রঞ্জিত করে গ্রহণ করে।

এই মোহের অবস্থায় সাধক নিজের পথ, নিজের সাধনার লক্ষ্য এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আত্মানুসন্ধানের পথে এই মোহই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক স্তর, কারণ এখানেই মানুষ নিজের বিচ্যুতিকেই অগ্রগতি বলে ভুল করে বসে।

মোহ থেকেই জন্ম নেয় স্মৃতিবিভ্রম। এখানে স্মৃতি বলতে সাধারণ স্মৃতি নয়, বরং সেই ভাগবতী স্মৃতি; যা সাধককে তার অন্তস্থঃ চেতনার কেন্দ্র ও ঈশ্বরস্মৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। মোহের আবরণে এই স্মৃতি চঞ্চল হয়ে পড়ে; কখনো উদিত হয়,

কখনো বিলুপ্তপ্রায় হয়।

ঈশ্বরস্মৃতি আর চিত্তের স্থায়ী আশ্রয় থাকে না; ফলে বাহ্য ঘটনার আঘাতে সাধক সহজেই বিচলিত হয়। ভাগবতী স্মৃতির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশক্তিও তার সত্ত্বগুণীয় দীপ্তি হারায়। তখন বুদ্ধি তমোগুণের প্রভাবে নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

তামসিক বুদ্ধি সত্য ও অসত্যের পার্থক্য করতে পারে না; তা মুক্তির পথ দেখায় না, বরং যুক্তি খুঁজে এনে পতনকেই ন্যায্যতা প্রদান করে। এভাবেই আসক্তি হতে শুরু হওয়া পতনের ধারা ক্রমে সাধকের সর্বনাশ ডেকে আনে।

এই সমগ্র ধারাটি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পতন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি এক ক্রমান্বিত অবক্ষয়, যেখানে প্রতিটি স্তর আগেরটির উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। আত্মানুসন্ধানের সাধনায় এই ধারাটিকে চিনতে পারাই প্রথম সুরক্ষা।

সংসারযোগীর পথ এখানেই সূক্ষ্ম। তার কর্তব্য ইন্দ্রিয়নির্বাহ করে চলা, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাবিকে চিত্তের অধিকারী না করা। কর্ম করতে হবে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি অধিকারবোধ ত্যাগ করে।

যখন কর্ম নিজের ভোগের জন্য করা হয়, তখনই মন গোপনে ফলের স্বপ্ন আঁকে; আর সেই স্বপ্ন পূর্ণ না হলেই ক্রোধ জন্ম নেয়। কিন্তু কর্ম যদি ধর্মবোধে, ঈশ্বরার্পণে বা কর্তব্যরূপে সম্পাদিত হয়, তখন ফল এল কি না; তা আর চিত্তকে আন্দোলিত করে না। এখানেই নিষ্কাম কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত।

ভাগবতী স্মৃতিই সংসারযোগীর প্রকৃত আশ্রয়। সংসারের নিয়মে বিষয় আসবে ও যাবে, কিন্তু স্মৃতির কেন্দ্রে যদি ভগবান অবস্থান করেন, তবে বিষয় মনকে গ্রাস করতে পারে না।

যেমন আগুনের নিকটে থাকলেও ভেজা কাঠ সহজে দগ্ধ হয় না, তেমনি ঈশ্বরস্মৃতিতে সিক্ত চিত্ত বিষয়সংস্পর্শে এলেও দগ্ধ হয় না। ইন্দ্রিয় কাজ করে, কিন্তু মন সাক্ষীর ভূমিকায় থাকে; এই সাক্ষীভাবই আত্মরক্ষার প্রকৃত কৌশল।

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয় দমন করতে বলেননি; তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত হতে দিয়ে অন্তরে এই বোধ জাগ্রত করতে, ‘‘আমি কর্তা নই; ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম করে চলেছে।’’

মানবদেহ যেন এক সুসমন্বিত যন্ত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহ কর্মের নীরব কারিগর। চোখ রূপের আহ্বানে সাড়া দেয়, কান শব্দের তরঙ্গে কম্পিত হয়, নাক গন্ধের মায়ায় আবদ্ধ হয়, জিহ্বা রসের স্বাদে বিভোর হয় এবং ত্বক স্পর্শের অনুভবে জাগ্রত হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির আহ্বানে মন আন্দোলিত হয়; আর সেই আন্দোলনের অনুবর্তী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কর্তব্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের সহচর হয়ে কর্মের রথকে সচল রাখে।

এই বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়কর্মযজ্ঞের মধ্যেও আত্মা রয়ে যায় নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। সে কর্তা নয়, সে ভোক্তাও নয়; সে কেবল নিঃশব্দ দর্শক;আকাশের মতো সর্বব্যাপী, অথচ স্পর্শাতীত। কিন্তু অজ্ঞতার আবরণে আচ্ছন্ন মানুষ এই আত্মাকেই কর্তা মনে করে এবং অহংকারের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। ‘‘আমি দেখলাম, আমি করলাম, আমি ভোগ করলাম’’; এই ‘আমিত্ব’-বোধই মানুষের বন্ধনের শৃঙ্খল।

যখন সাধক এই মহাসত্য উপলব্ধি করে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণে পরিচালিত ইন্দ্রিয়সমূহই ইন্দ্রিয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করছে, তখন তার চিত্তে এক অপূর্ব প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। কর্ম তখন আর বন্ধনের কারণ থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে সাধনার সোপান। ফলের মোহ ক্ষীণ হয়ে যায়, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কর্ম থাকে, কিন্তু কর্তার অহংকার বিলীন হয়।

তাই, এই তত্ত্ববাণী মানবজীবনের এক দীপশিখা, যা অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ আলোকিত করে। ইন্দ্রিয়ের কর্মকে ইন্দ্রিয়েই অর্পণ করতে পারলে মানুষ আত্মাকে চিনতে শেখে, আর আত্মপরিচয়ের সেই মুহূর্তেই কর্মের বন্ধন ছিন্ন হয়ে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই বোধ দৃঢ় হলে অহংকার ক্ষীণ হয়, আর অহংকার ক্ষীণ হলেই আসক্তির মূল শুকিয়ে যায়। তখন বিষয়চিন্তা থাকে বটে, কিন্তু তা আর আত্মপতনের কারণ হয় না।

ইন্দ্রিয় ও মনকে বিষয় হতে ফিরিয়ে ঈশ্বরমুখী করাই সাধকের যজ্ঞরক্ষা। কিন্তু সর্বদা নিবিষ্ট সাধনায় মগ্ন থাকা সংসারী সাধকের পক্ষে সহজ নয়। তাই জ্ঞানযোগীরা সংসারের অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করেও অন্তরের লক্ষ্য অপরিবর্তিত রাখেন।

বাইরে কর্ম, ভেতরে ঈশ্বরস্মৃতি— এই দ্বৈত অবস্থানই তাদের পথ। সংসারের কাজ তাঁরা করেন বটে, কিন্তু তাতে ডুবে যান না; কাজ যেন স্বপ্নের মতো— করতে হয়, তাই করেন, কিন্তু হৃদয় সেখানে বাঁধা থাকে না।

যেমন নদী বহুকাল ধরে আপন আপন নাম, পথ ও গতি নিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হলে আর নিজেকে পৃথক করে চিনতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরস্মৃতি জ্ঞানযোগীর প্রশান্ত চিত্তে প্রবেশ করে ভোগকামনার সকল তরঙ্গ ধীরে ধীরে আপন স্বরূপ বিসর্জন দেয়।

সেখানে আর কামনার কোলাহল থাকে না, চাহিদার হাহাকার থাকে না; থাকে কেবল এক গভীর, নিঃশব্দ বিস্তার; আর সেই নিঃশব্দতাই শান্তি। কারণ শান্তি কোনো অর্জনযোগ্য বস্তু নয়, শান্তি প্রকাশ পায় তখনই, যখন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই অবস্থায় সাধক বাইরে সংসারের সকল কর্ম সম্পাদন করলেও অন্তরে অবিচল থাকেন। আত্মচেতনার গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি আর সুখের সন্ধান করেন না। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যা তিনি এতদিন বাইরে খুঁজছিলেন, তা চিরকালই অন্তরের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এই পূর্ণতার মধ্যে আর কিছু যোগ করবার নেই, কিছু বর্জন করবারও নেই; যা আছে, তাই-ই যথেষ্ট। এই উপলব্ধিতেই জীবনের সমস্ত ভার আপনিই ঝরে পড়ে, আর চেতনা কোনো প্রয়াস ব্যতিরেকেই স্বতঃস্ফূর্ত শান্তিতে স্থিত হয়। □

ভারতাত্মা মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ যা ভারতবর্ষের জ্ঞান-কর্ম-আদর্শের মহা-প্রতিফলনের এক বিস্তৃত ভারত আলেখ্য; তা শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, এক মানব জীবন গ্রন্থ।

এক সংসারী নরোত্তম পুরুষ এই মহাকাব্যের নায়ক। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অবতার নয়, নরচন্দ্রমা! মহর্ষি বাল্মীকি দেবতাকে মানুষ করে আঁকেননি, শুরুতে বালকাণ্ডে দেবর্ষি নারদকে মহর্ষি বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেন—

কো অস্মিন সাম্প্রতং লোকে গুণবান কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।। (১। ১। ২)

অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি কে আছেন, যিনি অশেষ গুণসম্পন্ন, বীর্যবান ও ক্ষমাশীল; যিনি ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ ও কর্তব্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যিনি সদাচারে রত ও সকল প্রাণীর হিতকারী; যাঁর মনোহর কান্তি নয়ন সুখকর; যিনি অপরের দোষ অনুসন্ধান করেন না, যিনি জিত ক্রোধ, অপ্রমত্ত এবং ধৈর্যশীল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁকে ক্রোধাবিষ্ট দেখলে দেবগণও ভীত হন। যিনি বিদ্বান, অনুদ্ধত ও ভক্তিমান।

চরিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বানন্ কঃ, কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ।। (৩। ১। ৩)
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো, দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ,
কস্য বিভ্যাতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে?
(বালকাণ্ড-বাল্মীকি রামায়ণ)

তখন দেবর্ষি বলেছিলেন—'এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন,
থ চ সর্বগুণপেতঃ কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধনঃ
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে স্থৈর্যে চ হিমবালিব।
(বালকাণ্ড-বাল্মীকি রামায়ণ)

তাই শ্রীরামচন্দ্র মানবশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মর্যাদা পুরুষোত্তম! এই শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর চিন্তায়, চেতনায়, বিশ্বাসে, তাঁর জ্ঞানে; তাঁর মানসিক স্থিতিতে। তাঁর মানসিক উত্তরণের স্তর অর্থাৎ যে স্তরে তিনি স্থিতিলাভ করেছিলেন তা শিবত্ব প্রাপ্তির স্তর। এই স্থিতি, যা মর্যাদার সীমাহীন এক সীমার পরিপূর্ণ বিকাশ বা প্রকাশে উদ্ভাসিত।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জীবনের প্রতিটা মুহূর্তেই এই সীমাহীন সীমাকে অতিক্রম না করে তাকে মান্যতা দেওয়া বা তার মর্যাদা রক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। এই যে সীমাবোধ বা সীমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে লঙ্ঘন না করতে চাওয়া এটাই মর্যাদাবোধ। আর তাই, রাজপুত্র হিসেবে তিনি চাইলে না মানতেও পারতেন; যা তাঁর জনগণের সমর্থনকে কোনোরকম বিঘ্নিত করতো না; বরং জনসমর্থনের নিরিখে তিনিই জয়ী হতেন, এমত সবকিছুই তিনি মেনে গেছেন নির্দ্বিধায়।

বালকাণ্ডে দেখা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে শ্রীরাম যখন যাচ্ছেন তখন কিন্তু তিনি পিতার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থেই যাচ্ছেন। পিতা রাজা দশরথ কিন্তু কোনোভাবেই শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ছেড়ে দিতে চাননি। বরং ঋষির সাহায্যে তিনি স্বয়ং যেতে চেয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে শ্রীরামচন্দ্র তখনও ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করেননি। শুধুমাত্র ঋষি বশিষ্ঠের পীড়াপীড়িতে ষোড়শ বর্ষ পার না হওয়া শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। শ্রীরামচন্দ্র তো বলতেই পারতেন যে তিনি যাবেন না; বরং যদি বলতেন তাহলে পিতার সমর্থনও যে তিনি পরিপূর্ণভাবে পেতেন একথা নিঃসন্দেহে সত্য! একদিকে আপন শক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতি মর্যাদা, অপরদিকে দুই মহামুনি ও নিজের পিতৃমর্যাদা রক্ষা করবেন বলেই তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাড়কা বধে গিয়েছিলেন।

তাড়কা বধ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীলোক বিধায় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মর্যাদা রক্ষায় তিনি তাড়কা বধে দ্বিধাগ্রস্ত। সেই সময় ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন রাজধর্মের কঠোর পালননীতি। বলেছেন, 'চতুর্বর্ণের হিতের জন্যই রাজা বা রাজপুত্রকে স্ত্রীহত্যাও করতে হয়। রাজা প্রজাপালক। তাই, প্রজারক্ষার জন্যই রাজাকে নৃশংস বা অনৃশংস, পাতকযুক্ত অর্থাৎ দোষযুক্ত কর্মও করতে হয়। এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য।' ঋষি বলেছেন, 'রাজ্যভারনিযুক্ত নামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।' এর অর্থ যাদের উপর রাজ্য পালনের ভার ন্যস্ত, তাদের এটাই সনাতন ধর্ম। উদাহরণ দিয়েছিলেন, বিরোচন সুতা মন্থরার, যিনি সমগ্র পৃথিবী নাশ করতে চাওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে বধ করেন। উদাহরণ দিয়েছিলেন মহর্ষি ভৃগুর পতিব্রতা স্ত্রীর (শুক্রাচার্যের মাতা), যিনি ত্রিভুবন ইন্দ্রশূন্য করতে চাওয়ায় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হন। বললেন— 'তোমার নিজ ইচ্ছায় নয়, আমার ইচ্ছায় ও আদেশে তুমি একে বধ করো।' মহর্ষির আজ্ঞার মর্যাদা রাখতেই শ্রীরামচন্দ্র নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অজুহাত খাড়া করেননি। বলেছিলেন— 'গো-ব্রাহ্মণ ও সমগ্র দেশের হিতের জন্য আপনার ন্যায় প্রভাবশালী মহাত্মার আদেশ

আমি নৈর্ব্যক্তিক চিত্তে পালন করব।'

এই নৈর্ব্যক্তিক চিত্তই 'অনিচ্ছার-ইচ্ছা', যা কঠোর সাধ্য সাধনার একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছালে তবেই সাধক-যোগী-ঋষিরা উপলব্ধি করেন; মাত্র ষোড়শ বর্ষ অনুত্তীর্ণ এক কিশোরের পক্ষে সেই উপলব্ধি একমাত্র পুরুষোত্তম না হলে সম্ভব নয়। যদিও, পিছন থেকে মহর্ষির উসকানিমূলক আদেশে তিনি বাধ্য হলেন তাড়কাকে বধ করতে; তবুও সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে যেখানে একদিকে আক্রমণোদ্যত তাড়কা, অন্যদিকে তিনি এক ষোড়শ বর্ষ অনুত্তীর্ণ কিশোর তখনও তিনি অনুজ লক্ষ্মণকে বলছেন— 'এ স্ত্রী বলে আমি একে বধ করতে উৎসাহিত নই। আমি শুধু এর গতি, বল ও পরাক্রম নষ্ট করে দেব।' এ তো সম্পূর্ণরূপে নারীর প্রতি সুমহান মর্যাদা বোধেরই পরিচয়!

শ্রীরামচন্দ্র, ওই কিশোর বয়সেই যিনি স্থিতপ্রজ্ঞতার ভূমালাভ করেছেন, যিনি সুখে দুঃখে বীতস্পৃহ; অন্যের ইচ্ছাই যাঁর ইচ্ছা; যাঁর কাছে বিশ্বের যে কোনো মারণাস্ত্র শুধুমাত্র স্মরণ করলেই প্রকটিত হতে পারে, তিনি সেই মারণাস্ত্রগুলির সম্মানে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকেই গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি জানতেন গুরু কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র একমাত্র গুরুশক্তি দ্বারাই বীর্যবান হয়! সেইরূপে দিব্যাস্ত্র একমাত্র গুরুস্থানীয় শক্তি দ্বারা পুটিত হলেই সর্বাংশে ফলবতী হয়। শুধু তাই নয়, তাড়কা বধের পর ঋষি প্রদত্ত দিব্যাস্ত্রগুলির প্রত্যাহার মন্ত্রও তিনি করজোড়ে জেনে নিয়েছিলেন শুধু অস্ত্রগুলি ও মহর্ষির মর্যাদা রক্ষার্থে। তিনি যে শস্ত্র বিদ্যারও সুযোগ্য পাত্র ছিলেন এই প্রত্যাহার মন্ত্র জানতে চাওয়া তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। সব অস্ত্র সব কিছুতে, সব সময় বা সবার উপরে যে প্রয়োগ করা উচিত নয় এই বাস্তবিক জ্ঞান থাকাই হলো প্রকৃত সুমেধাবী শস্ত্রবিদ ও বিদ্যার এক মর্যাদাশীল অভিজ্ঞান!

হরধনু ভঙ্গ যখন করতে চলেছেন, তার আগেও তিনি বলছেন যে, তিনি এই দিব্যধনু সমাদরে ও সযত্নে স্পর্শ করছেন। যা ওই দিব্যধনুর প্রতি এবং ওই ধনুর স্বত্বাধিকারী হর অর্থাৎ মহাশিবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ।

এই বালকাণ্ডেই আমরা দেখি পিতা দশরথ যতক্ষণ মহাতেজা পরশুরামের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ততক্ষণ পিতার প্রতি সম্মান, সৌজন্যবশত ও ঋষি পরশুরামের সম্ভ্রম রক্ষার্থেই তিনি নীরব। তখনই একমাত্র তিনি মুখ খুললেন যখন ঋষি পরশুরাম পিতা দশরথকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু তাঁরই সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলেন শ্রীরামচন্দ্রকে! তখন একরকম বাধ্য হয়েই শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে শোনা গেল— 'প্রথমত, আপনি ব্রাহ্মণ তাই এবং পিতা এতক্ষণ কথা বলছিলেন সেজন্যই নীরব ছিলাম। শুধু তাই নয়, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আপনার আত্মীয়। তাই, প্রাণসংহারক বাণ আমি নিক্ষেপ করতে পারছি না। আপনার শিবপ্রদত্ত ধনুতে যে বাণ আমি নিক্ষেপ করছি তা আপনার যথেচ্ছ গমনের মনোরথ গতি এবং আপনার তপোবলে প্রাপ্ত নিজস্ব স্বর্গলোক ধ্বংস করবে।' ঋষির মহত্ত্ব এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ণশ্রেষ্ঠকে দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ সীমা লঙ্ঘন না করে মর্যাদা প্রদর্শন করা থেকেই বোঝা যায় একটি কিশোরের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ মর্যাদা পুরুষোত্তম।

অযোধ্যাকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামের বনবাসে যাওয়ার চিত্রকল্প যখন অঙ্কিত করছেন তখনও দেখা যাচ্ছে পিতার সম্মান রক্ষা বা পিতাকে প্রতিজ্ঞা পালনের সুযোগ করে দিতেই তিনি বনবাস স্বীকার করছেন স্বেচ্ছায়। রাজা দশরথ কখনই পুত্রকে বনবাসে যেতে বলছেন না, কারণ তিনি দ্বিধান্বিত, লজ্জিত ও পুত্রের বিপদাশঙ্কায় বার বার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। শুধুমাত্র পিতাকে সত্য রক্ষার সুযোগ করে দিতে বা পিতৃবচনের সত্যতা বজায় রাখতেই তিনি বনবাসী হবার সংকল্প গ্রহণ করলেন নির্দ্বিধায়। আত্মত্যাগও যে কতটা মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে এটা তারই উদাহরণ। তিনি কতটা মর্যাদাপূর্ণ হতে পারেন এটা তারই উদাহরণ। তিনি কখনোই বলেননি যে মাতা কৈকেয়ীর এ এক অনধিকার চর্চা। বলেননি, মাতা কৈকেয়ী রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করছেন নিজের পুত্রকে রাজা বানানোর অভিপ্রায়ে।

শ্রীরামের প্রতি যে জনসমর্থন আগাগোড়া ছিল সেকথা শ্রীরামের অগোচরও ছিল না। তবু, সেই সময়ের প্রতি, সেই সত্যের প্রতি, সেই বচনের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সমাজের প্রতি মূল্যবোধে তিনি নীতি-নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। পিতাকে রক্ষা করেছিলেন এক বিরাট দায়ভার থেকে। একদিকে মাতা কৈকেয়ীকে বলছেন যে শ্রীরামের প্রতি অর্থাৎ পুত্রের প্রতি তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে তাই মাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছাই শ্রীরামের কাছে আদেশ স্বরূপ। অন্যদিকে ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাতে মাতৃমর্যাদা লঙ্ঘন করতে না পারে তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে ভ্রাতা লক্ষ্মণ কোনো সাধারণ মানুষ নন তিনি 'রাজপুত্র'। মাতার প্রতি কোনো উষ্মা প্রদর্শন লক্ষ্মণের পক্ষে সমীচীন নয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে না দিয়ে রাজপুত্রের মর্যাদা রক্ষার উপদেশ দিয়ে প্রমাণ করলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার কর্তব্যবোধ। এমনকী, মাতা কৌশল্যা যখন বলছেন যে পিতা যেমন গুরু, মাতাও তেমনই গুরু! তাই মাতা হিসেবে শ্রীরামকে তিনি বনবাসে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না তখনও শ্রীরাম মাতৃবন্দনা করে মাতাকে নিরস্ত করছেন এই জন্য যে কোনো সতী-স্ত্রীর তাঁর স্বামীকে লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাই মাতা যাতে স্ত্রীধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না হন সেইজন্য মাতার নারীধর্ম রক্ষাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে মাতাকে সুমিষ্ট বচনে প্ররোচিত করছেন তাঁর সতী-স্ত্রীর ধর্মকে মস্তকোপরি স্থান দিয়ে। শ্রীরামের পূর্ণতার প্রকাশ দেখি তাঁর বাকচাতুর্যে, তাঁর বাকপটুতায়, তাঁর কথার ইন্দ্রজাল রচনায়। তিনি যে এই ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিষাদ জাতি ভারতীয় সমাজে একটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়। সেই নিষাদ গণপতি গুহ-কেও তিনি বন্ধুত্বের মর্যাদা স্বরূপ আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। রাজপুত্র স্বরূপ অহঙ্কারে তিনি কোনোদিনও বদ্ধ ছিলেন না। আবার বনবাসের নীতি মেনে নিষাদরাজ উত্তম আহার্য প্রস্তুত করলেও তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৃণশয্যায় শয়ন করেন। শুধু তাই নয়, এই বন গুহের করতলগত, এটি লোকজনে পরিপূর্ণ এবং প্রতিনিয়ত গুহের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁকে বনবাস পালনের নিয়ম-নীতি অনুসরণে বাধা দান করতে পারে সেই ভাবনার হেতু তিনি আরও নির্জন বনে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করেন।

একজন মানব কেমন ভাবে ধীরে ধীরে তাঁর বিভিন্ন সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে নিজেকে মহামানব তথা দেবমানবে

উন্নীত করছেন তাঁর আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে আনতে যান। ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের স্বাভাবিক প্রতিহিংসামূলক আচরণকে তিনি তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞতার বিচ্ছুরণে করলেন প্রশমিত। বোঝালেন ভ্রাতাদের পালন ও তাঁদের সুখই তাঁর কাম্য। ভ্রাতা ও প্রিয়জনদের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ মর্যাদাবোধ যে তাঁর নিজ কামনা-বাসনার অতীত; সেই মহা-চুম্বকীয় আবেশে আবিষ্ট করে ভ্রাতাদের তিনি ভ্রাতৃকলহের অমর্যাদাপূর্ণ নিন্দার থেকে নিশ্চেষ্ট করলেন। ভ্রাতা ভরতের উদ্দেশ্য লক্ষ্মণ না বুঝলেও শ্রীরামচন্দ্রের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। উদার হৃদয়, নীতিবোধ ও নিঃস্বার্থ নির্মল ভালোবাসায় তিনি মানব হয়েও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যের আকর সমৃদ্ধ।

কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই ঋষি জাবালির নাস্তিক্যতত্ত্ব-কে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তিনি খণ্ডন করতে পেরেছিলেন। বলতে পেরেছিলেন— 'আমার মঙ্গলের জন্য যে মত আপনি দিলেন তা 'কর্তব্য' ও 'আপাত' পথ্যের মতো মনে হলেও আদতে 'অকর্তব্য' ও 'অপথ্য'।' বেদের মর্যাদা ও মানব ধর্মকে সুপ্রযুক্ত যুক্তির সাহায্যে ঋষি জাবালির সম্মুখে উপস্থাপিত করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, কর্তব্যের কাছে, সত্যের কাছে আর সবই নেহাত ক্ষুদ্র। শুধুমাত্র তত্ত্ব নয়, বাস্তবের কষ্টিপাথরের নিরিখে তা পরখ করে মানব সমাজের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তার সারবত্তা।

নিজ দেয় কথার মর্যাদা রক্ষার্থে অরণ্যকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের এমন একটা দিক তুলে ধরেছেন যা এক কথায় অনবদ্য। দণ্ডকারণ্যে যখন তাঁরা অবস্থান করছেন তখন শ্রীরামচন্দ্র মা-সীতার নিষেধ, অনুযোগ ও সমালোচনাকে কথার ইন্দ্রজালে আচ্ছাদিত করে মা-সীতাকে সম্পূর্ণরূপে সম্মোহিত করে দিয়েছিলেন। মা-সীতার প্রতিটি বক্তব্যকে সম্মানের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বীকার করেও তিনি তপোবন আশ্রিত মুনি-ঋষিদের রক্ষার্থে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা মা-সীতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীর প্রতি সমশ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। মা-সীতা কখনোই চাননি যে শ্রীরামচন্দ্র তপোবনে বনচারী রাক্ষসদের হত্যা করে বনবাস ধর্মকে অপবিত্র করেন! কারণ, একথা সত্য যে হিংসা, হিংসাকেই উজ্জীবিত করে। দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসরা শ্রীরামের বৈরিতা করেনি। বিনা অপরাধে অন্যের প্রাণনাশ কখনোই সমীচীন নয়। কেবল আর্তদের রক্ষার্থেই ক্ষত্রিয় বীরদের অস্ত্রধারণ করতে হয়। এমনতর কথা ও যুক্তিও মা-সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেন। তথাপি, শ্রীরামচন্দ্রের মনোমুগ্ধকর ভাষণে মা-সীতা স্বামীর ধর্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

তাই, শ্রীরামচন্দ্র যখন বলবেন যে, একমাত্র প্রকৃত বন্ধুই বন্ধুকে এমনতর সুদুপদেশ দিতে পারে; হিতকর উপদেশ এমনকী গঠনমূলক সমালোচনা একমাত্র সত্যকার প্রিয় মানুষ তার প্রিয় মানুষটিকে করে; শুধু তাই নয়, মা-সীতা তো প্রথমেই স্বীকার করেছেন, যে বিপন্ন আর্ত হয়ে যাতে কেউ হাহাকার না করে সেজন্যই ক্ষত্রিয় বীরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়, তাই দণ্ডকারণ্য নিবাসী কঠোরব্রত পালনরত মুনি-ঋষিদের বিপন্নতার প্রতিকারার্থে যদি অস্ত্রধারণ করতে হয়, তাই দণ্ডকারার্থে তিনি অস্ত্রধারণ করতে চান। তখন মা-সীতা আর কথা বাড়াননি। তিনি বুঝেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র যা বলছেন অর্থাৎ এই মুনি বা ঋষিরা তাঁদের নিজস্ব তপপ্রভাবেই এই রাক্ষসদের প্রতিহত করতে পারলেও তাঁদের অর্জিত তপোশক্তি তাতে খণ্ডিত হবার আশঙ্কা আছে, সেকারণেই তাঁরা একাজ থেকে বিরত থাকেন। একথা নিতান্ত সত্য বলেই শ্রীরাম তাঁদের রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজের প্রাণ বির্সজন দিতে পারেন মা-সীতা বা ভ্রাতা লক্ষ্মণকেও পরিত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নিজ প্রতিজ্ঞা বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে দেওয়া শপথ তিনি রক্ষা করবেনই!'

একটা কথা এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রীরাম তৎকালীন বহুপত্নীক সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ হয়েও নিজে ছিলেন এক পত্নীক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও তিনি বহুবিবাহ করেননি। মা-সীতা নির্বাসিতাই হোন বা অপহৃতাই হোন, মা-সীতাই তাঁর একমাত্র স্ত্রী। ভালোবাসা ও গার্হস্থ্য ধর্মের মর্যাদাস্বরূপ এই দৃষ্টান্ত আজও সহস্র বৎসরান্তেও সনাতন ভারতের এক মহান ঐতিহ্য!

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালীর মতো মহাবীরকে তিনি হত্যা করতে বাধ্য হন তা শুধুমাত্র সুগ্রীবের বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতেই নয়, এখানে রাজধর্মের যে আরও একটা দিক 'কূটনীতি' তার মর্যাদা রক্ষাও পরিলক্ষিত হয়। সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে, যে বিশেষ সময়ের দাবিতে অগ্রাধিকার হিসেবে যেটা উপযোগী কর্ম অর্থাৎ বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বিনীত বালীকে হত্যা করে পুরো কিষ্কিন্ধ্যার সাহায্যে মা-সীতাকে উদ্ধার করা এবং কর্তব্যের মর্যাদা রক্ষা করা এই বিষয়টার উপরেই তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। সে কারণে তাঁর প্রতি অঙ্গদের ক্ষত্রিয় ধর্ম লঙ্ঘনের যে তীব্র অভিযোগ তাও তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেন। তিনি চাইলে বালীর সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে পারতেন, কিন্তু তাতে সুগ্রীবের মর্যাদাহানি হতো। আবার, বালী হয়তো শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু করতে না দিয়েই নিজ ক্ষমতাগর্বে মা-সীতাকে উদ্ধার করে দিতেন! কারণ, বালী ছিলেন চূড়ান্ত স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত এক তীব্র আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব। অথচ, তারফলে শ্রীরাম হতেন অপযশের ভাগী। সেক্ষেত্রে নিজ মর্যাদাবোধ ও স্বাধীন পরিকল্পনার স্বার্থেই বালী অপেক্ষা সুগ্রীবই ছিলেন তাঁর স্বাভাবিক মিত্র।

শুধু কি তাই! অযোধ্যা থেকেও কোনো সাহায্য তিনি নেননি মা-সীতাকে উদ্ধার করার জন্য, যা তিনি চাইলেই পেতে পারতেন। অযোধ্যা ত্যাগের পর থেকে সেখানকার কোনো সুবিধাই তিনি দাবি করেননি। একদিকে রাবণের অত্যাচার, অপরদিকে বালীর স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ে ভীত বানর উপজাতিকে নিয়ে তিনি সেনা গঠন করলেন। রাবণের অত্যাচারে নৈমিষারণ্য থেকে শুরু করে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ছিল অতিষ্ঠ। অথচ, যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাবণমুক্ত লঙ্কাকে তিনি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করেননি। যা তিনি চাইলেই করতে পারতেন। পরিবর্তে তিনি লঙ্কারই ভূমিপুত্র বিভীষণকে সেখানকার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। বিজিত দেশের উপর কোনো দাবি না করাটাও কিন্তু তাঁর কূটনৈতিক মর্যাদাবোধ ও মহান উদার দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয়।

বিজিত শত্রু রাবণের শেষ অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন উপদেশ নিতে। রাবণের বর্ণশ্রেষ্ঠতা, তাঁর পাণ্ডিত্য ও তপস্যার প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। অসামান্য বীর রাবণ শত্রু হলেও

তাঁরও মর্যাদা তিনি কোনোক্রমেই উল্লঙ্ঘন করেননি।

মা-সীতা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক জেনেও, লোকশিক্ষার জন্য, বিশেষ করে সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে রাজধর্ম পালনের দ্বারা কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এবং মা-সীতার চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসংশয় থেকেও যাতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা-সীতাকে ভবিষ্যতে ভারতের মহারানি হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নেয় সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে; ভারত সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষার্থেই, মা-সীতার অগ্নিপরীক্ষা হলো। এর জন্য মা-সীতাও যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, তা কিন্তু নয়! মা-সীতাও জানতেন এর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা। কারণ তিনি শিক্ষিত ও রাজনীতি অভিজ্ঞা একজন রাজকন্যা। স্বামী যে তাঁকে সন্দেহ করেন না এ বিষয়ে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে সংশয়হীন প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র এ কাজ এজন্যই করেছেন যাতে ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে তাঁর যে প্রজাসুখে সুখী ও প্রজার দুঃখে দুঃখী ভাবমূর্তি; সেই ভাবমূর্তি সাধারণে প্রতিভাত হয়ে গণতন্ত্রের মর্যাদাকে সুদৃঢ় করুক। লোক দেখানো নয়, এ ছিল প্রকৃত হৃদয় সংস্পর্শে ভাস্বর! প্রকৃত ভালোবাসার মর্যাদা যে লোকদেখানো হতে পারে না, সেই সত্যকে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর হৃদয় সম্রাজ্ঞীর নীরব সহায়তায়।

আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্রের সার্বিক বিকাশ, গণতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা শ্রীরামের রাজত্বকালীন সময়ে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে অযোধ্যায় ফেরার পর রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃত সৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমসত্ত্ব মিশেলে তিনি যেভাবে রাজ্যশাসন করে দেখিয়েছেন তা মর্যাদাপূর্ণভাবে ইতিহাসে 'রামরাজত্ব' হিসেবে স্থায়ী আসন করে নেয়! তাই আজও আমরা 'রামরাজত্ব' এই শব্দবন্ধটির উল্লেখ করে থাকি। একজনও সাধারণ প্রজার সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা তাঁর নজর এড়াতো না। প্রতিটি বিষয়ে মন্ত্রীদের বা রাজকর্মচারীদের পরামর্শ নিয়ে তারপর তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর রাজ্য পরিচালনা নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে ছিল। জনগণ ও সমাজব্যবস্থা এই দুটির মর্যাদা রক্ষা যে একমাত্র সৎ রাজতন্ত্র দ্বারাই সম্ভবপর তা তিনি করে দেখিয়েছিলেন। সে কারণেই অযোধ্যায় ফেরার পর তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যে ঘুরতেন ও রাজ্যের প্রতিটা খবরাখবর রাখতেন। এটি সঠিকভাবে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের এক অমোঘ পদ্ধতি যা অতীব ফলদায়ী, তা অনুসরণ করতে গিয়ে বিগত চোদ্দ বছরের যে ভয়ঙ্কর শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ তিনি ভোগ করেছেন সেটা কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাজ্যে ফিরে শাসক হবার পর তিনি যদি বিলাস-ব্যসন ও বিশ্রামে কাল কাটাতেন তাহলে কারও কিছু বলার ছিল না, কিন্তু কর্তব্যের প্রতি মর্যাদাবোধ তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত রেখেছিল।

উত্তরকাণ্ডে, মা-সীতার নির্বাসন ও পাতাল প্রবেশ আদৌ ঘটেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিতর্ক থাকলেও মা-সীতা যে সন্তান সম্ভবা এটা একমাত্র মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশের সময় মা-সীতা দেবর লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তথাপি, বলা যায় জনসাধারণ কিছু না বললেও; কিছু রাজকর্মচারী ও আমলার মধ্যে মা-সীতাকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছিল তার প্রতিবিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞকেই শ্রীরাম ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, তৎসহ যজ্ঞের রীতিনীতি ও মা-সীতার মর্যাদা রক্ষা করতেই তিনি গর্ভবতী মা-সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। অতীব বুদ্ধিমতী মা-সীতাও বুঝেছিলেন সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার্থেই তাঁর স্বামী তাঁর নিজ স্বার্থ বলি দিয়ে স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, বাল্মীকির মতো ঋষিকবি যিনি হিন্দুপ্রাণের সাক্ষাৎ প্রতিভূ, তাঁর দ্বারা মা-সীতার নির্বাসন, পাতাল প্রবেশ বা তপস্বী শম্বুককে শুধুমাত্র শূদ্র বলে বধ করা— এমত রচনা সম্ভব হতে পারে বলে একদল মানুষ জয়ঢাক পেটান! তবুও, তাদের শ্রীরাম সমালোচনাকে একটু জবাব দিতে বলা যায়— তপস্বী শম্বুক যখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন— 'দেবলোক বিজয়ের জন্যই তাঁর এই উগ্রসাধনা।' শ্রীরামচন্দ্র বুঝেছিলেন শম্বুকের সাধনা ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভের সাধনা নয়, এ শুধু দেবলোকের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্তির সাধনা। মানসিক উত্তরণের চাহিদা শম্বুকের ছিল না। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেবলোক বিজয় বা এই ধরনের সিদ্ধি হয়তো সৃষ্টির নিয়ম-নীতি ও ঐকতান নষ্ট করে দিতে পারত!

অধ্যাপক ড. রামশঙ্কর ত্রিপাঠী তাঁর History of Ancient India গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪) পরিষ্কার বলেছেন, 'রামায়ণ এক ব্যক্তির রচনা নয়। বহু ঘটনার পরে সংযোজিত প্রক্ষেপিত। সপ্তম কাণ্ড-সহ প্রথম কাণ্ডেও এমন সব বিষয়ের উল্লেখ আছে যা মধ্যবর্তী কাণ্ডগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' বাল্মীকি রামায়ণের উল্লেখ আমরা মহাভারতেও পাই। ঐতিহাসিক ড. ম্যাকডোনাল অনুমান করেন খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো অব্দের শেষে প্রথম কাণ্ডের কিছু অংশ ও সপ্তম কাণ্ড মূল রামায়ণে যুক্ত হয়। দেশবরেণ্য নেতা ও ইতিহাসবিদ ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— ''পুরো উত্তরকাণ্ডটাই প্রক্ষিপ্ত। মূল বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পরই রামায়ণ সমাপ্ত একথা রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক বা কাব্য নেই। তাই, উত্তরকাণ্ডটি মূল রামায়ণের অংশ হলে কাব্য হিসেবে 'রামায়ণ' খর্ব হয়ে যেত। হিন্দুপ্রাণ সে দুঃখকেই বোঝে, যে দুঃখ আনন্দকে আরও মধুর করে তোলে। হিন্দু সেই বিরহ-ই সহ্য করতে পারে, যে বিরহ মিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আত্যন্তিক দুঃখে যার পরিসমাপ্তি হিন্দুর স্নেহপ্রবণ প্রাণ তা সহ্য করতে পারে না।''

উপনিষদ জোর দিয়ে সে কথাই মনে করিয়ে দেয়—

''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি।।''

(তৈতিরিয়োপনিষদ্ ▯ ভৃগুবল্লী ▯ ২য় অনুবাক)

—অর্থাৎ আনন্দ হতেই জীবের জন্ম, আনন্দেই জীবনযাত্রা এবং অবশেষে অনন্দেই লয়।

সবশেষে বলা যায়, আসলে আমরা শ্রীরামের আদর্শকে, তাঁর বোধকে পূজা করি! আমরা পূজা করি সনাতন ভারতবর্ষের চিন্তনকে, তার সংস্কৃতিকে। শ্রীরাম সাধারণ মানবের সমস্ত অক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে রেখে মানব থেকে হয়ে উঠেছেন দেবমানবে এবং দেবমানব থেকে উত্তরিত হয়েছেন অবতারে। হয়ে উঠেছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম!

সত্য ও ধর্মস্থাপনের উৎসব শ্রীরামনবমী

সরোজ চক্রবর্তী

শ্রীরামনবমী ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক পবিত্র তিথি। চৈত্র শুক্লা নবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীরামের জন্মতিথিটি হিন্দুরা একটি উৎসব হিসেবে পালন করে থাকেন। বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি 'শ্রীরামনবমী' নামে পরিচিত। রামনবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হলো অধর্মকে নাশ বা ধ্বংস করে ধর্মকে স্থাপন করা, অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভশক্তি সূচনা করা।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশ্ব সংসারের পালক। যুগে যুগে তিনি নানা অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। বিশ্ব সংসারের সকল মানুষকে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের পথ প্রদর্শন করতে এবং মিথ্যার উপর সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করতে শিখিয়েছেন। ভগবান রামের উল্লেখ যে শুধুমাত্র প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায় তা নয়, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থেও শ্রীরামের উল্লেখ রয়েছে।

রামনবমী একটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় অনুষ্ঠান। মন, প্রাণ ও দেহকে পবিত্র করার জন্য এই উৎসব পালন করা হয়। অশুভ শক্তির অপসারণ ও ঐশ্বরিক শক্তির আগমনের জন্য রামনবমী উৎসব পালন করা হয়। শ্রীরাম অত্যাচারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। শত্রুদের বিনাশ করে, অধর্মকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি বনবাস জীবন স্বীকার করেন। চোদ্দ বছর বনবাসে থেকে তিনি রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। এই চোদ্দ বছর নানা ঝড়, বাধা, বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও তিনি নিজ লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তাই শ্রীরামের জীবনকে ভারতবর্ষে আদর্শ হিসেবে মনে করা হয়। তাই তাঁকে 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' বলা হয়। তাঁর শাসনে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত এবং সেই রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার অব্যাহত ছিল। এজন্য তাঁর শাসনকালকে 'রামরাজ্য' বলা হয়। শ্রীরাম অন্তঃহীন প্রেম, সাহস, শান্তি, শক্তি, ভক্তি, কর্তব্য ও মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই ভগবান শ্রীরাম বিরাজমান। রামময় ভারত। সমগ্র ভারতে শ্রীরামকে আরাধ্য দেবতা হিসেবে আরাধনা করা হয়। শ্রীরাম ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। কবি ইকবাল ১৯০৮ সালে শ্রীরামের গৌরবে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। তিনি ভগবান রামকে 'রাম-ই- হিন্দ' বলতেন। তিনি কবিতায় লিখেছিলেন রামের অস্তিত্বে গর্বিত হিন্দুস্থান। গান্ধীজী ভারতে 'রামরাজ্য' -এর প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। এই রামরাজ্য ন্যায়বিচার, সাম্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

শ্রীরাম শুধুমাত্র হিন্দুদেরই আরাধ্য নন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। শ্রীরামের নামে ভারতের কোটি কোটি নাগরিক একাত্মতা অনুভব করে। বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার মহান পুরুষ শ্রীরাম।

রামনবমীর দিন সকালে সূর্যদেবকে জল প্রদান করা হয়। সূর্যদেবের আশীর্বাদ নিয়ে ধার্মিক ও সদাচারী ব্যক্তিরা সারাদিন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন। এদিন রামায়ণ পাঠ ও ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসে এবং পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। রামকথার বর্ণনা শুনে, রামকাহিনি পড়ে এই দিনটি পালন করা হয়। অনেকে মন্দিরে যান, অনেকে বাড়িতে শ্রীরামের মূর্তি পূজা করেন, অনেকে 'জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম' বিজয়মন্ত্র জপের মাধ্যমে শুভশক্তির প্রার্থনা করে থাকেন।

শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হয়ে মানব জাতিকে শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি মানবীয় আচরণই করেছেন। পুত্র হিসেবে পিতার প্রতি এবং রাজা হিসেবে প্রজাদের প্রতি কর্তব্য কী হওয়া উচিত তার চমৎকার উদাহরণ শ্রীরাম চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি শ্রীরাম চরিত্রটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, এর প্রভাব যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজে অটুট রয়েছে। পিতৃভক্তি, প্রজাবাৎসল্য, পরোপকার, মানবপ্রেম, লোভহীনতা, সত্যপালন ইত্যাদি রামচরিত্রের আকর্ষণীয় দিক। শ্রীরাম চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়। শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয় মননে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

রামরাজ্য কেমন তার বর্ণনা রয়েছে বাল্মীকি রামায়ণে। সেখানে বলা হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে সকলে আনন্দিত, সৎ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সকলে ছিলেন বিনয়ী ও কর্তব্যপরায়ণ। রামরাজ্যে কেউ দরিদ্র ও দুঃখী ছিলেন না। ছিল না বেকারত্ব, কর্মহীনতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা। ছিল না সৌজন্যবোধের অভাব। মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বপ্রকারের শত্রুতা ভুলে গিয়েছিল। শ্রীরামের প্রভাবে অসাম্য ও বৈষম্য দূরীভূত হয়েছিল। নারীরা পেয়েছিল সম্মান। রামরাজ্যে নারীর নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিল। প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসেবে প্রজাদের কাছে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন কাছের মানুষ ও মনের মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'শ্রীরামচন্দ্র হলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা সর্বোপরি আদর্শ নৃপতি।' তাই শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথিটি ভারতবাসীর কাছে পবিত্র দিন, শপথ নেওয়ার দিন। রামনবমী মিলনের উৎসব, ভালোবাসার উৎসব, পবিত্রতার উৎসব, সত্য ও ধর্মস্থাপনের উৎসব। □

বলতে হয় কম, শুনতে হয় বেশি

আমরা কতটা বলব এবং কতটা শুনব, তারও একটা নিয়ম আছে। এ প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিক এপিকটেটাসের

উক্তিটি মডার্ন ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাতেও গুরুত্ব দেওয়া হয় — "We have two ears and one mouth and should use them in that proportion." অর্থাৎ আমাদের দুটি কান ও একটি মুখ আছে। ব্যবহারের সময় আমরা যেন ওই অনুপাতে তাদের ব্যবহার করি। সরল করে বলা যায়, শোনা ও বলার প্রক্রিয়াটি হবে ২ ঃ ১। তবে জীবন তো এত অঙ্ক কষে চলে না। আর এত অঙ্কের কচকচানি নিয়ে চলাও যায় না। তাই সহজ নিয়মটি হলো বলতে হয় কম, শুনতে হয় বেশি।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে আসে, 'এই নিয়ম মেনে যদি সবাই কম বলতে শুরু করে, তাহলে তো আসল কথাটাই আর বলা হবে না। তাছাড়া সবাই যদি কম বলে, তবে শোনার জন্য তো বিশেষ কিছুই থাকবে না।' আসলে কথাটির মাধ্যমে বলার চাইতে শোনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বেশি। কারণ, সত্যি কথাটা হলো— বলা সহজ কিন্তু শোনা কঠিন।

তাছাড়া আমরা কম বলব আমাদের স্বার্থে। কম বললে আমাদেরই লাভ। আমরা যত কম কথা বলব ততই আমাদের জীবনীশক্তি অটুট থাকবে। আমাদের মস্তিষ্ক ততই ধারালো হবে। মনোজগতে একটা প্রশান্তির ভাব বিরাজ করবে।

তবে ইংরেজিতে hearing ও listening -এর মধ্যে তফাত আছে। প্রথমটির অর্থ শব্দকে শুধুমাত্র শনাক্ত করা, আর দ্বিতীয়টির অর্থ শোনা শব্দের অর্থ বুঝে তাকে উপলব্ধিতে আনা। সুতরাং প্রথম প্রক্রিয়াটি প্যাসিভ কিন্তু দ্বিতীয়টি অ্যাক্টিভ। অর্থাৎ প্রথমটি নিষ্ক্রিয় কিন্তু দ্বিতীয়টি সক্রিয়। প্রথম প্রক্রিয়াটিতে তেমন মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আবার শুধু মনোযোগ দিলেই হয় না, গভীর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

"Listening is a highly complex, interactive process, by which spoken language is converted to meaning in the mind." এই 'meaning in the mind' শব্দগুচ্ছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে, তা বুঝতে গেলে একটি উদাহরণ দিতে হবে। কমপিউটার মানুষের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষা বোঝে না, তাই সে তাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তন করে নেয়। ঠিক তেমনই listening -এ শব্দ মনের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তিত হয়। আর তখনই সেই ভাষা মনের কাছে অর্থবোধক হয়। কোনো বক্তব্য শুনতে এবং সেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে প্রয়োজন অসীম ধৈর্য। তাই কখনো কখনো বলা সহজ হলেও শোনা সবসময়ই কঠিন। শোনার প্রতি মানুষের আগ্রহহীনতার কারণ হয়তো সেটাই।

—অজয় ভট্টাচার্য

জাতীয় উদ্যান

মরুভূমি জাতীয় উদ্যান

রাজস্থানের জয়সলমের শহরের কাছে জয়সলমের ও বাড়মের জেলাজুড়ে অবস্থিত এই জাতীয় উদ্যান (ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক)। এটি ৩১৬২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং ভারতের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যানগুলির মধ্যে একটি। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত। উদ্যানটির প্রায় ৪৪ শতাংশ বালির টিলায় ঢাকা। বাকি অংশ পাথুরে লবণাক্ত সমতল। এখানে ৬০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির উভচর, ৫১ প্রজাতির সরীসৃপের আসাবস্থল। ১০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, চিঙ্কারা, মরুভূমির শেয়াল ও মরুভূমির বেড়াল রয়েছে। এখানকার সংগ্রহশালায় ১৮ কোটি বছরের পুরনো ডাইনোসরের জীবাশ্ম সংরক্ষিত আছে। এই উদ্যানে উটের পিঠে ও জিপ সাফারি পর্যটকদের জন্য খুব আকর্ষণীয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০৫

सप्त-ककाराः (सप्त प्रश्नवाचकाः शब्दाः)
সাতটি প্রশ্নবাচক শব্দ।
अभ्यासं कुर्मः –
किम्, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम्, किमर्थम्,
(কী, কোথায়, কতগুলো, কখন, কোথা থেকে, কেমন করে, কেন)
किम् द्वारा प्रश्न।
अभ्यासं कुर्मः –
भवतः नाम किम्?
भवतः पिता किं करोति?
भवान् किं खादति?
भवति किं पठति? भवान् किं लिखति?
बालकः किं पश्यति?
किम् द्वारा प्रश्नं कुर्वन्तु।
किम् দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

ভালো কথা

দোল

দোলের দিন সকালে আমরা শাখায় গিয়ে ধ্বজস্থান আবির দিয়ে সাজালাম। তারপর ৮টায় প্রার্থনা করে পরস্পর আবির মেখে একটা গ্রুপ ফোটো তুললাম। তারপর পাড়ায় বেরিয়ে যাকেই সামনে পাচ্ছি তাকেই নমস্কার করে আবির মাখালাম। এভাবে আমরা অর্ঘ্যদা, মৌনবদা, আমাদের বাড়ি, দিব্যদের বাড়ি, বিবেকদা, বিষ্ণুদা, অভিরূপ, হিমাংশুদা, প্রান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্তদা, বাবাইদাদের বাড়ি আবির ও রং খেলে ২৬ নং সঙ্ঘ কার্যালয়ে এসে রং খেলে একেবারে ভূত হয়ে গেলাম। হোলির গানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই নাচলাম। আমি একটি বন্দুক নিয়েছিলাম, সেটাকে রং ভরে সবাইকে দিচ্ছিলাম। দিব্য এক ব্যাগ রংবেলুন এনেছিল। ২৬ নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল দিব্যর মা, দেবুদার বোন মামদি। আমাদের উৎসাহদাতা ছিলেন দেবুদা। সুকেশদা সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন, আমরা রঙে লাল করে দিয়েছি। আর একটি কথা, সবার বাড়ি কিছু-না-কিছু খেয়ে সবারই পেট একেবারে ভরে গিয়েছিল।

দীপমাল্য সাউ, ষষ্ঠশ্রেণী, রাধা-মাধব সাহা লেন, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ণা র মৃ চ	(১) স্ত স্তা ক্রা রা ভা চি
(২) ক চি জ স্তা	(২) ল ম ল ঙ্গ হ জ

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) হিমসাগর (২) হরিবাসর

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) সুদূরপরাহত (২) সমদৃষ্টিসম্পন্ন

(১) সৌরভ বিশ্বাস, হাজরাতলা, ঠাকুরনগর, উঃ ২৪ পরগনা। (২) শিবম রায়, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, ইংলিশবাজার, মালদা। (৪) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশভক্তি ও দেশভাবনা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ ভারতের এক মহান চিন্তাধিনায়ক এবং মৃত্তিকালগ্ন জাতীয়তাবাদী কথাসাহিত্যিক। দেশসেবা ছিল তাঁর জীবনসাধনা;জাতীয় আন্দোলন এবং সাহিত্যরচনা ছিল তার মাধ্যম। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও দেশের প্রগতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক সংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর দেশভাবনার দূরদৃষ্টি আমাদের কাছে বড়ো বিস্ময়কর বলে মনে হয়। বর্তমানে দেশ যে যে সমস্যার সমাধানের কথা ভাবছে, স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব', 'প্রতি ঘরে ত্রিরঙ্গা', বীরসা-মুণ্ডা' দিবস, 'আমার মাটি আমার দেশ' ইত্যাদি যে যে সঙ্কল্পে ব্রতী হয়েছে; আজ থেকে ষাট-সত্তর-আশি বছর আগে সে সব বিষয়ে তারাশঙ্কর সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ২৬ জানুয়ারি স্মরণে বলেছেন, ''গৃহশীর্ষে চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হোক; আলোয় আলোয় সাজিয়ে দাও নগরী গ্রাম; উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকপ্রান্ত পর্যন্ত।'' তারাশঙ্করের সাহিত্যপাঠে আমাদের মনে হয় জাতি ও জাতীয়তার চিন্তায় দেশের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশ সম্পর্কিত ধারণায় সচেতন করতে তিনি যা বলেছেন বর্তমানে দেশভাবনার পথে তা যেন অনিবার্যভাবে অনুসরণীয়।

পরাধীন ভারতবর্ষে অর্ধশতাব্দীকাল এবং পঁচিশ বছর স্বাধীন দেশের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির সদস্য তারাশঙ্কর মার্কসবাদের সাম্য-সমাজব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবোধের আধার থেকে গান্ধীবাদকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের উন্নয়ন, স্বাধীনতার সতেরো বছর আগে গ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে কারাবরণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দেশভক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী তারাশঙ্কর আদালতে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, রাজনীতি ছাড়ব না, দেশকে আমি ভালোবাসি। সুভাষচন্দ্র বসুর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, কোনো ব্যক্তিপূজা নয়, আমার উদ্দেশ্য দেশসেবা। সাহিত্যপথে চৈতালী ঘূর্ণি, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ ও মহিমাকে প্রকাশ করেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার নিবিড় অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন, সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক আদর্শ বা ইংরেজ তাড়ানোর নাম স্বাধীনতা নয়; শোষণমুক্ত সমাজই তাদের স্বাধীনতা, তাদের দেশ। তারাশঙ্করের দেশভাবনার ভিত্তি ছিল বাস্তু তথা তাঁর জন্মগ্রাম। সকল জীবের ধাত্রী যে ধরিত্রী, জাতির কাছে তিনিই দেশ, মানুষের কাছে তিনি বাস্তু। বাস্তুকে চিনেই তিনি দেশকে চিনতে চেয়েছিলেন। জন্মগ্রামকে ভিত্তি করে দেশদেখার যে আদর্শ তারাশঙ্করের দেশভাবনার পরিচয়ে জানা যায়, বর্তমান দেশের ভাষায় এর নাম 'আমার মাটি আমার দেশ'। তাঁর মতে দেশ কেবল একটি

ফঃ ৬

ভূখণ্ডমাত্র নয়; নিজের এলাকায় বসবাসকারী সব শ্রেণীর মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানগত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে দেশকে জানতে হয়। দেখেছিলেন জমিদার ও মহাজনের শোষণে গ্রামের মানুষ শহরে চলে যাচ্ছে। জেনেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জন্মভূমি, আর্যসভ্যতার গৌরবময় ভারতের বুকে শুধু শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। বর্ণগতভাবে সমাজের অন্ত্যজ, আর্থিক দিক থেকে অসহায় এইসব মানুষ জাতির অভিন্ন অঙ্গ হয়েও জনজাতি। হাজার হাজার বছর ধরে জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করা হয়নি বলেই বিদেশির হাতে ভারতবর্ষ বার বার পরাজিত হয়েছে। জমিদার ও উচ্চবর্ণের গণ্ডী অতিক্রম করে তারাশঙ্কর জনজাতির সেবায় এবং তাদের জাতিতে উন্নীত করার সংকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি জানতেন, পরাধীনতা-মুক্তির সঙ্গে সকল মানুষের অর্থবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সমরস সমাজ গড়তে পারলে তবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। তবেই দেশের আত্মনির্ভরশীল প্রতিটি নাগরিক ভাবতে পারবে— আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমার। তখনই অমিত শক্তিতে শক্তিশালী জাতির অভ্যুত্থান ঘটবে। দেশভক্তি মানে দলীয় রাজনীতি নয়; দেশভক্তি হলো মাটির সঙ্গে মানুষের, সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের ভক্তিভাবান্বিত ভালোবাসার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যা কর্মনিষ্ঠা ও সেবার সঙ্গে দেশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে।

তারাশঙ্কর যে ভারতবর্ষকে চেয়েছিলেন সেই ভারতকথা ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী নয়; তা ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য এবং স্বার্থ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে বিচিত্র প্রকাশে প্রকাশিত এক নতুন মহাভারত। তিনি জানতেন ভারতবাসীর কাছে দেশের প্রতি ক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, নদী তীর্থ, পর্বত দেবতাত্মা। ভারতবাসী জানে, যে মাটি অন্নদান করে সে অন্নদা; যে জল শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সে প্রাণদা; অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় প্রদায়িনী এই ধাত্রীদেবী ভারতভূমি আমাদের দেশ, আমাদের রাষ্ট্র। তারাশঙ্করের দেশভাবনা যেন আমাদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে, অন্নদা-প্রাণদা শস্যময়ী ভারতভূমি আমাদের ধারক এবং সুরক্ষার দুর্গ;তাই তিনি দুর্গা। তারাশঙ্করের দেশভাবনায় ধাত্রীদেবতার আদর্শ ভারতীয় সভ্যতার চিরায়ত কথা। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে ভূমিদেবীর উক্তি— 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং।' স্কন্দপুরাণের আর্য-আচরণীয় আসনশুদ্ধির মন্ত্রে সেই ধাত্রীদেবতাকে স্মরণ করে বলা হয়, 'অনন্ত শক্তি বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করে আছেন আর তুমি আমাদের ধারণ করে আছো।' তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারাশঙ্করেরও দেশভক্তির মূলমন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্'। আরণ্যক সভ্যতার অরণ্য-ইতিহাসকে তুলে ধরে তারাশঙ্কর স্বামী বিবেকানন্দের মতো বলেছেন, মুচি-মেথর-চণ্ডাল-শূদ্র-ব্রাহ্মণ সকলেই ভারতমাতার সন্তান। ভক্তিনিষ্ঠার জ্ঞান ও কর্মে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। ভারতীয় চেতনার উত্তরাধিকারী তারাশঙ্কর 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র সাধক; গণদেবতার পূজারি। তারাশঙ্করের জীবনসাধনা জাতি ও জাতীয়তার পথে মনুষ্যধর্মের সাধনা। পাঁক থেকে পঙ্কজের জন্মের মতো সেই সাধনা কমলদল বিহার। সেই অর্থেই বোধ হয় ভারতবর্ষ কমলদল বিহারিণী সুহাসিনী। দেশধর্মের সুরক্ষায় তিনি গীতার সশস্ত্র আদর্শ থেকে বুদ্ধের অহিংসায় উন্নীত হওয়ার কথা বলেছেন।

২

স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনকে তারাশঙ্কর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে দেখেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি বাক্য আজ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমূল্য সম্পদ বলেই মনে করতে হয়। তাঁর মতে উন্নত ও প্রগতিশীল দেশ মানে নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আত্মনির্ভরশীল জীবনবিপ্লবে নবজীবন বিন্যাসের জয়যাত্রা; কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতায় স্বাধীন দেশের জীবন বিন্যাস সেইভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক চেতনায় তারাশঙ্কর অত্যন্ত কঠোর ও সত্যনির্ভর ছিলেন। তাঁর মতে গণতন্ত্র একটি শাসন পদ্ধতিই নয়, তার মূল হলো গণতান্ত্রিক মানসিকতা, কিন্তু নেতাদের কারণে সেই মানসিকতা বিনষ্ট হয়। তারাশঙ্কর দেখেছিলেন স্বাধীন দেশের মূল সমস্যা রাজনীতির নগ্ন জটিলতা; শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দলগুলিতে দুর্নীতি-পরায়ণ চতুর চক্রীদের প্রভাব ও প্রাধান্য বেশি। তিনি দেখেছিলেন দেড়শো বছরের সাধনার ফল মূল্যবান জীবনমূল্যে লব্ধ স্বাধীনতাকে রাজনীতির নগ্ন-জটিলতা বিনষ্ট করে এক গভীর অন্ধকারকে আহ্বান করেছে। বুঝেছিলেন যে, ''এই মিথ্যাসর্বস্ব রাজনীতির পথে ভারতের মানুষের জীবনে শান্তি সম্ভব নয়।'' বলেছেন, ''স্বাধীন ভারতের গোটা সংবিধানখানার ধারার পর ধারা পড়ে প্রমাণ করা যায় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। ভোটের দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করার অত্যধিক আগ্রহে গণতন্ত্র ধ্বজাবাহীরা দেশের সর্বনাশ করেছে।'' বলেছেন, দলগত কলহে, দল ও ব্যক্তিস্বার্থের টানাটানিতে জাতীয় কল্যাণ এবং জাতি গঠনের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়েছে। দেখেছিলেন, স্বাধীনতার দু'দশকে ভৌগোলিক সংগঠন ও পুনর্বিন্যাসে দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে, আধুনিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে কিন্তু ভারতবর্ষে এক জাতি গড়ে ওঠেনি, জাতীয় সংহতি তৈরি হয়নি। বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালজী ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সংগঠন করতে পেরেছিলেন কিন্তু আত্মিক সংগঠনে চরিত্রবান মানুষ এবং দৃঢ় চরিত্রের আদর্শবাদী সমাজের সৃষ্টি করতে পারেননি। হয়নি। গান্ধীজী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে জাতীয়তা গড়ে উঠেছিল সেই দিন বিগত; সেই হিন্দুস্থান শেষ হয়ে গেছে। মরে গেছে সেই ভারতবর্ষ।

দেশ ও সমাজকে পরিচালনা করে সরকার এবং সরকারকে পরিচালনা করে নেতা তথা মন্ত্রীবর্গ। জনসাধারণের ভোটে নেতা তথা মন্ত্রীবর্গ নির্বাচিত হন কিন্তু মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকে না। তাঁদের কাছে মানুষের উন্নয়ন বা দেশ বড়ো নয়; দল বড়ো, লোভ-লালসাময় আগ্রাসী মনোভাব বড়ো। যেখানে রাজনীতির অর্থ রাজা হওয়ার নীতি, যেখানে 'আমি চোর, তুমি চোর, সে চোর; সরকারি কর্মচারী অসৎ, অসাধু; জনপ্রতিনিধি অসাধু অসৎ; সেখানে আর জাতীয়তাবোধ কোথায়; জাতিই-বা কোথায়! স্বাধীনতা সেখানে কোন আসনে বসে স্থির থাকবে?' তাঁর মতে, জাতি গঠনের প্রথম ভিত্তি হলো বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস; যেখানে আমরাই আমাদের শাসন

করতে সক্ষম হয়ে উঠব। জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভের নীচে নির্ধারিত নীতিবাক্য 'সত্যমেব জয়তে'— সত্যের প্রতি ভরসা ও বিশ্বাস— জাতি ও জাতীয়তার মূল ভিত্তি। সাংবিধানিক সত্যকে পালন ও প্রয়োগের নিষ্ঠায় চিন্ময় করে তুলবেন যাঁরা তাঁরা আধিকারিক-নেতা-মন্ত্রী; কিন্তু আগ্রাসী মন্ত্রী-নেতা-আধিকারিকেরা ভয়ঙ্কর লোভ ও লালসায় সত্যকে সমাধিস্থ করে আসছেন। এমন অসৎ ও অসাধুতার কারণে জাতি ও জাতীয়তাবোধ হারিয়ে দলের কাছে দেশ অপেক্ষা রাজনীতি ও নেতৃত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে; এবং তার মন্দ প্রভাব পড়েছে সামাজিক উন্নয়ন এবং সমাজের অর্থনীতিতে। এমন ভয়াবহ বিষজর্জর রাজনীতি;জড়বাদী রাজনীতি, আগ্রাসনের রাজনীতি। পঞ্চায়েত পুরসভা থেকে সরকারি অফিস, জনসাধারণের বাকস্বাধীনতা থেকে অধিকারবোধ, নেতা নির্ধারণ, এমনকী সম্প্রীতি বিনষ্টি-সহ ধর্ষণ ও হত্যার মাঠেও রাজনীতি। রাজনৈতিক সরকার সমাজজীবনকে গ্রাস করেছে। রাজনীতির প্রবল পীড়নে সমাজ আপেক্ষিক স্বাধীনতা হারিয়েছে; রাজনীতি আজ গণতন্ত্রের সংকট এবং সাধারণ মানুষের কাছে বড়ো আতঙ্কের বিষয়। রাজনীতির কাছে মানুষের পরিচয় একজন ভোটার হিসেবে। এই সমস্যার সমাধানে তারাশঙ্করের নির্দেশিত পথ — মন্ত্রীমণ্ডলীর শুদ্ধীকরণ-সহ দেশের উন্নয়নে মাটি ও মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। ভারতীয় চেতনায় অনুশীলনের পথে চিত্তশুদ্ধ নেতা তৈরি হলে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুই সদর্থক পথে প্রগতিশীল হয়ে উঠবে। তারাশঙ্কর এমন নেতার কথা বলেছেন যিনি মহামানবিকতার সঙ্গে আদর্শবাদী নেতৃত্ব দেবেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি জাগ্রত, শুদ্ধ, সত্ত্ব, পবিত্র চিত্ত, সত্যাশ্রয়ী, নির্ভীক-সাধক, পুরোহিত। আমরা তাঁর যজমান।

তারাশঙ্কর বলেছেন, জাতির পরিচয় তার একাত্মতায়, কিন্তু মানুষের ঐক্য যান্ত্রিক উপায়ে হয় না। মানুষকে বুদ্ধি ও শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান জীবে পরিণত করা যায় কিন্তু মানুষ মানুষ হয় আত্মিক জাগরণে। তাঁর মতে, শিক্ষা কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং মনুষ্যত্বের জাগরণ। বলেছেন, 'আজ সমগ্র শিক্ষার মধ্যে তথ্য অনেক আছে কিন্তু কোনো নীতিবাদ নেই। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট তৈরির ব্যাপক প্রসার হচ্ছে কিন্তু মনুষ্যত্ব কী ও কীসে, তার সংজ্ঞা ক্রমশ অস্পষ্টতর হয়ে চলেছে।' এর ফলে শিক্ষিত সমাজ চতুর থেকে চতুরতর হচ্ছে কিন্তু মমত্ববোধে যে মনুষ্যত্বের অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হয়, জীবনের সেই উৎসটি হারিয়ে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং এক 'আত্মিক সাধনায়' মানুষের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ তৈরি হয়। যে বোধের মাধ্যমে একজন গর্ব করে বলতে পারে 'আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।'

৩

চীন-ভারত, ভারত-পাকিস্তান, বেরুবাড়ি, গোর্খাল্যাণ্ড ইত্যাদি সীমান্ত সমস্যার কারণগুলি সম্পর্কে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতের বড়ো সমস্যা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমস্যা এবং সে বিষয়ে তাঁর ব্যাকুলতা ছিল অনেক বেশি। ইতিহাস অনুসন্ধানে তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষে ইসলাম সাতশো বছর রাজনীতিকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক সাধনাই করেছে। তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে পৃথক নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার মূলে ছিল নিজেদের দিকে একটা শক্তিকে সংহত করবার রাজনীতি; ধর্ম এখানে অবলম্বন মাত্র। স্বাধীন দেশেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূলে রয়েছে পাকিস্তানে মজহব-আশ্রিত রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা। তারাশঙ্কর দেখেছিলেন, দেশভাগের পর হিন্দুরা পূর্বপাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে;তার কারণ হিন্দুত্ব অর্থাৎ ধর্ম। মুসলমান ভারতবর্ষের বাসিন্দা হয়েও পাকিস্তানের জয়ধ্বনি দিচ্ছে;তার কারণও তার মজহব। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ; পাকিস্তান ইসলামি দেশ। অনেক মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিতে ভারতে নিরাপদ এবং অন্তরালে ভারত বিরোধিতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু হিন্দুর তেমন কোনো অধিকার নেই, যে অধিকার বলে হিন্দু হিন্দুকে বাঁচাতে পারে, হিন্দু নারীকে ধর্ষণের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে পারে। ভিন্ন দেশে হিন্দু সংখ্যালঘু বলে অত্যাচারিত এবং ধর্মে হিন্দু বলে ভারতের হিন্দুর কাছেও তাদের কোনো বিশেষ দাবি নাই। বলেছেন, ওখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের এখানে আনা হোক। যারা ভিন্ন দেশমুখী তারা বিদায় হোন। যারা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ধাক্কায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন;তাঁদের অহিংসার পথ ধরে অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে হবে। এ দায় দেশকে নিতে হবে। বলেছিলেন, ভারতের সীমান্ত উন্মুক্ত হোক; পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই পুণ্যকর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রমাণ দিক তাঁরা হিন্দুবিরোধী, ভারতবিরোধী নন। বিপন্ন হিন্দুর পুনর্বাসন এবং ভারতবিদ্বেষীদের নির্বাসনের অধিকারে তারাশঙ্কর কি তবে হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বলতে চেয়েছিলেন? এমন কৌতূহল উঠে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে করি।

তারাশঙ্কর জানতেন সময় ও পরিস্থিতির কারণে মানবচিত্তের পরিবর্তন হয় কিন্তু মানুষকে জয় করার চিরায়ত কোনো সহজ রাস্তা মানবসভ্যতায় আবিষ্কার হয়নি। দেশের রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতায় মানুষ একদিকে যেমন বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত, তেমনি নতুন পথের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্তও। তারাশঙ্করের কথায়, মানুষের ভাবনাই হচ্ছে কালের নতুন রূপ। বাস্তবের আঘাতে সেই ভাবনার জন্ম হয়। আমাদের কৌতূহল সেই আঘাত যদি শাসন ক্ষমতার দিক থেকে আসে! বন্দে মাতরম্ মন্ত্রগীতে ধর্মনিরপেক্ষতার কুণ্ঠাবোধ থাকলে তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতার আদর্শপথে সঙ্গীতটির আক্ষরিক ব্যাখ্যা যদি তুলে ধরা যায়! অন্নদা-প্রাণদা ধাত্রীদেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সার্বজনীন ও সর্বজনীন সত্য। মাটি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের সনাতন সত্যটিকে সাংবিধানিক নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরলে ভারতভূমি ধাত্রীদেবতাকে সম্মান জানানো হয়। যে ভারতভূমি আমাদের সকলের সুরক্ষার দুর্গ, সেই ভারতের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে নিয়মের নিষ্ঠায় নিত্য সমবেত ধ্বনিতে বন্দনাগান ধ্বনিত করে তুললে জাতীয় আবেগের পুনর্জাগরণ কি অসম্ভব! ধাত্রীদেবতা মানে ভারতমাতা; ভারতমাতা মানে তো ভারতবাসীর ধাত্রীদেবতা। আসুন, আমরা ভক্তিভরে সেই মায়ের বন্দনা করে তারাশঙ্করকে শ্রদ্ধা জানাই।

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা

অবনীভূষণ মণ্ডল

আমরা যারা দায়িত্বে আছি তাদের বাড়িতে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। গোয়েন্দা প্রায় সময়ই বাড়িতে হানা দিত। নভেম্বর মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 'জন সংঘর্ষ সমিতি' গঠন হলো। পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে 'লোক সংঘর্ষ সমিতি' গঠন হয়। নির্দেশ এল আর বসে থাকা নয় এবং রাস্তায় নামতে হবে। সপ্তাহে একটি করে দল সত্যাগ্রহ করবে। প্রান্ত প্রচারক বসন্তদা সকলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বললেন। বৈঠকে অনাদি কুণ্ডু প্রশ্ন করলেন, যারা চাকরি করেন তারাও কি সত্যাগ্রহে যেতে পারবে? বসন্তদা বললেন সেটা তাকেই ঠিক করতে হবে। ঠিক হলো ৭ নভেম্বর অনাদিদার নেতৃত্বে ৮ জন প্রথম দলে সত্যাগ্রহ করবেন। সেই অনুযায়ী কোর্টে গিয়ে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে লাগলেন— (১) জরুরি অবস্থা তুলে নাও। (২) সেন্সরশিপ তুলতে হবে। (৩) জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই। (৪) আরএসএস-কে বৈধ কর।

পুলিশ সকলকেই প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে লকআপে রেখে দিল। পরে কোর্টে তুলে জেলখানায় নিয়ে গেল। ডেপুটি জেলার জেলখানায় সত্যাগ্রহীদেরকে ব্যঙ্গ করে নানারকম কথা বলতে লাগলেন। পরদিন কোর্টে ৬ জনকে ১৫১ ধারা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু অনাদিদা ও লব দেকে DISIR ধারায় জেলে আটকে রাখার সময় অনাদি কুণ্ডুকে ডিআইবি অফিসে নিয়ে গিয়ে ভীষণভাবে শারীরিক নিগ্রহ করা হলো।

সত্যাগ্রহের পর আমাদের উপর গোয়েন্দাদের নজরদারি অনেক বেড়ে গেল। একদিন বাড়ি থেকে খবর পেলাম আমি যেন আজ বাড়িতে না আসি। পুলিশ বাড়িতে এসেছিল এবং ঘরে আলমারির বই ঘাঁটাঘাঁটি করে বিভিন্ন কাগজপত্র খুঁজছিল। কিন্তু কোনো আপত্তিকর কিছু পায়নি। সেদিন রাত্রিবেলায় স্টেশন মোড়ে এক ছাত্রীর বাবার কাঠগোলাতে রাত্রি কাটাই। শীতকাল তাই কাঠগোলার লোকেরা তাদের বাড়ি থেকে কিছু বিছানা, কম্বল দিয়ে গেল। কাঠগোলায় পাহারাদার হিসেবে আমি রাত কাটালাম। সকালেই সুভাষ সরকারের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মাসিমা সকাল থেকে কিছু খাইনি বলে জলখাবার ব্যবস্থা করলেন। ওই দিন পুলিশ একযোগে যেমন শহরের বাড়িতে হানা দেয় তেমনি আমার গ্রামের বাড়িতে ও স্কুলেও হানা দিয়েছিল। ২য় দলে ১৪ নভেম্বর সুভাষের নেতৃত্বে পাঁচজন সত্যাগ্রহ করে। তাদের কোর্ট থেকে ১৫১ ধারা দিয়ে জামিনে মুক্তি দিয়ে দেয়।

তারপর তৃতীয় দলে আমার সত্যাগ্রহে যাওয়ার অনুমতি এল। ২১ নভেম্বর আমার সঙ্গে রইল মণ্ডলকুলির চারজন। (১) অজিত মণ্ডল, (২) গঙ্গাধর মণ্ডল, (৩) শ্যামসুন্দর দাস মণ্ডল ও (৪) শ্যাম সুন্দর মণ্ডল।

আমরা বাঁকুড়ার রানিগঞ্জ মোড়ে বীর সাভারকরের গলায় মালা দিয়ে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে কোর্টের উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের দাবিগুলির সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে ও হ্যান্ডবিল বিলি করতে করতে এগিয়ে চলেছি। মাঝ পথে ওসি দীপক পাল আমাদের ধরে ধরে তার জিপে তুললেন। গাড়িতে বসে যতবার ধ্বনি দিচ্ছি ততবারই ওসি দীপক পাল আমার মুখের উপর থাপ্পড় মারতে মারতে থানায় নিয়ে এল। CI টাউন বাবুকে তিরস্কার করলে টাউনবাবু রেগে গিয়ে আমার গালে আবার চড় বসিয়ে দিল। সেদিন লক-আপে থাকার পরের দিন দুপুরে কোর্টে তুললো। আমাদের DISIR ধারা দিয়ে জেলেখানায় নিয়ে এল। জেলের মধ্যে দেখলাম, আনাদিদা ও লব দে ছাড়াও বিষ্ণুপুর থেকে অজিত ভাণ্ডারি ও স্বপন ঘোষকে মিসাতে জেলে রেখেছে। আমরা মোট ন' জন একসঙ্গে থাকতে লাগলাম। ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে গীতাপাঠ করতাম। সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ। বিকেলে শাখা শুরু করে প্রার্থনা হতো। এইভাবে সরকারি খরচে J.T.C চলতো। যেহেতু আমরা কোনো অপরাধ করিনি সেইজন্য জেলের মধ্যে খুব আনন্দেই সব কার্যক্রম করতাম। সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করতো একজন স্বয়ংসেবকের হাত দিয়ে বুলেটিন পেতাম, আর তার হাত দিয়েই বাইরে আমাদের খবরাখবর পাঠাতাম। এর মধ্যে নিরক্ষর কয়েদিদের লেখা পড়া শেখানোর জন্য আমাদের বাড়ি থেকে শ্লেট, পেন্সিল ও বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ) আনিয়ে নিলাম। এইভাবে চলতে চলতে আমাদের কাছে খবর এল জামিন নিয়ে বাইরে আসতে হবে। ১ মার্চ ১৯৭৬ জামিন

নিয়ে আমরা সাতজন সত্যাগ্রহী বাইরে এলাম। কিন্তু সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরা দিতে হতো। ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচন ঘোষণা হলো। জেলে বসে কতগুলি দল মিলে 'জনতা পার্টি' গঠিত হয় মোরারজী দেশাই এর নেতৃত্বে। আমরা জেল থেকে বেরিয়ে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় রাজনীতির কাজে যুক্ত হয়ে গেলাম।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর দলের পরাজয় হলে প্রত্যাহৃত হয় জরুরি অবস্থা। কেন্দ্রে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা দলের সরকার গঠিত হলো। অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানী মন্ত্রী হলেন। নানাজী দেশমুখকে মন্ত্রী করতে চাইলে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে চিত্রকূটে চলে গেলেন। আবার সঙ্ঘের শাখা উৎসাহের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর প্রবাস প্রদেশে প্রদেশে শুরু হয়ে গেল। বিপুল অভ্যর্থনার মাধ্যমে কলকাতায় শহিদ মিনারে সভা হলো।

১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ভারতমাতা ও গঙ্গামাতার প্রতি জনতার মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব জাগ্রত করা। এই রথযাত্রার প্রধান মাধ্যম যে তিনটি রথ তার মধ্যে দুটি রথ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিল। প্রথম রথটা গঙ্গাসাগর থেকে সোমনাথ এবং দ্বিতীয়টি ছিল নেপালের পশুপতি নাথ থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত। সুসজ্জিত যন্ত্রচালিত মুখ্য রথে ছিল ভারতমাতার সুন্দর একটি চিত্র এবং দুটি বড়ো কলস। যার মধ্যে একটিতে ছিল গঙ্গোত্রী থেকে সংগৃহীত গঙ্গাজল এবং অপরটিতে ছিল ভারতের সমস্ত নদীর পবিত্র জল সংগ্রহের জন্য। এটা ছিল 'ভারতমাতা রথ'। স্থানীয়ভাবে অপর একটি রথ ছিল শ্রীচৈতন্য রথ (শ্রীচৈতন্যের চিত্র সংবলিত)। ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেশবাসীর মধ্যে দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের প্রবল জোয়ার কীভাবে সৃষ্টি করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্গাপুর থেকে এই দুটি রথ বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে নতুনগঞ্জ নিত্যানন্দ আশ্রমে রাত্রির বিরতি নেয়। সেদিন আশ্রমে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য একটি স্বাগত সমিতি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত বাগ্মী স্বনামধন্য রাখহরি চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮৯ সালে ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে নাগপুরে পূর্বতন ও বর্তমান প্রচারকদের সম্মেলন হয়। এতে আমি ও অশোক গোপ পূর্বতন প্রচারক হিসেবে যোগ দিই। সেই সময় নাগপুরে পূর্ণগণবেশে প্রায় ৪৫০০ স্বয়ংসেবকের পথসঞ্চলন হয়। একসময়ের বাঁকুড়া জেলা প্রচারক শ্রী দামোদর সারলকরের বাড়ি ইয়তমলে যাই। তারপর শম্ভাজীনগরেও যাই। শম্ভাজীনগর থেকে সরকারি বাসে মাত্র ১৫ টাকায় ৬টি দর্শনীয় স্থান (দেবগিরি দুর্গ, অজন্তা-ইলোরা, ঘৃষ্ণেশ্বর প্রভৃতি) দর্শন করি। ইয়তমল যেখানে বাবাসাহেব থাকতেন সেই স্থানও দর্শন করি।

১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীরামশিলাপূজন অনুষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও গ্রামে গ্রামে রামশিলা পূজন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং অযোধ্যাতেও নির্বিঘ্নে সমস্ত শিলা পৌঁছানোর জন্য সরকার সবরকম সহযোগিতা করে। ৯/১১/৮৯ তারিখে নির্ধারিত সময়েই অযোধ্যাতে শিলান্যাস কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়। তারপর রামজ্যোতি রথ, রামজানকী রথ, সন্তযাত্রার মতো বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে অযোধ্যায় করসেবার ডাক এলো। করসেবার যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে শহিদ মিনার ময়দানে বিশাল হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অশোক সিংহলজী উপস্থিত ছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বিজয়ানন্দজীর ওজস্বী বক্তৃতা শুনলাম। অনেক মঠের বহু সন্ত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বলা হলো আমরা করসেবায় যাবো কিন্তু পুলিশের সঙ্গে কোনরকম সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। তখন বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ছিলেন ডাঃ শচীন সিংহ। ১ম দলে যারা গেল তাদের জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে যথারীতি টিকিট কেটে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু বারাণসী স্টেশনে পুলিশ তাদের শনাক্ত করে নামিয়ে দিল এবং সেখানে একটি অস্থায়ী জেলে (স্কুলবাড়ি) রেখে দেওয়া হলো।

২য় দলে ২৬ অক্টোবর আমরা জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম। ট্রেন সুলতানপুর স্টেশনে এলে ঘোষণা শুনলাম ট্রেন তার নির্ধারিত রাস্তা ফৈজাবাদ দিয়ে যাবে না—যাবে ঘুরপথে লক্ষ্ণৌ স্টেশন দিয়ে যাবে। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তখন কয়েকজন করসেবক ট্রেনের হোসপাইপ কেটে দেয়, ফলে ট্রেন অচল হলো, আমরাও যেদিকে খুশি নেমে পড়লাম। আমাদের কাছে সূচনা ছিল যেখানেই নামি না কেন সেখানে প্রত্যেক গ্রামে কমিটি গঠন করা আছে তারাই অযোধ্যার পথ দেখিয়ে দেবে। দেখলাম আমাদের দেখে কয়েকজন গ্রামবাসী যুবক এগিয়ে এলেন। তখন ২৭ অক্টোবর সকাল ৭টা। সেখানে টিউবওয়েলে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। তারা আমাদের জন্য বাতাসা ও মুড়ি নিয়ে এলেন। তাদের পরামর্শ অনুসারে পরবর্তী গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ঠিক অন্য গ্রামের লোকেরাও বেরিয়ে পরবর্তী গ্রামে পৌঁছে দিল। এভাবে চলতে চলতে অটোয়া জেলায় গোমতী নদীর ধারে এলাম। সেখানে গ্রামবাসী আমাদের রান্না করার জন্য উপকরণ নিয়ে এসেছেন। তারপরই মুলায়মের পুলিস তাড়া করে। নদীতে পারাপারের জন্য যে মাঝি ছিল সে বিনা পয়সায় করসেবকদের ওপারে পৌঁছে দিল। আমার সঙ্গে তখন আছে ২৬ জন। গোমতী নদীর ওপার থেকে কয়েকজন গ্রামবাসী বন্দুক নিয়ে পুলিশকে তাড়া করলে পুলিশ পালিয়ে যায়। সেখানে ছিল পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি। তার বাড়িতে দই, চিড়া ও সরবতের ব্যবস্থা হলো। তাছাড়া আমাদের গামছায় বাতাসা মুড়ি ও ছোলা ভাজা দেওয়া হলো। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে একটি গ্রামে পৌঁছালাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্থানীয় বন্ধুরা বললেন এখানে পুলিশ চৌকি আছে, একটু পরেই ওরা চলে যাবে। একটি আমবাগানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের চা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। একটু পরে আমাদের ২৬ জনকে একটি ঘরে বসিয়ে বলা হলো আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন। আমরা আপনাদের জন্য খিচুড়ি রান্না করছি। সেই অনুযায়ী রান্নার উপকরণ নিয়ে এসে কাঠ জ্বালিয়ে রান্নার কাজ চলছে। হঠাৎ পুলিস এসে আমাদের ঘরে হানা দিল। বললে এই ঘরে নিশ্চয়ই করসেবক আছে।

আমাদের জুতো লাইন করে রেখেছিলাম তা দেখে পুলিশ আরও নিশ্চিত হলো। শাটার খুলে পুলিশ বললো চলো থানায়। আমরা কোনরকম আপত্তি না করে থানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন যারা রান্নার কাজ করছিলেন তারা চীৎকার করে পাশের গ্রামের লোককে পুলিসের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। (ক্রমশ)

শুধু খিদিরপুর নয়, বালিগঞ্জও : কলকাতার 'মিনি পাকিস্তান' হয়ে ওঠা এক প্রবল অশনিসংকেত

কলকাতার বর্তমান মেয়র কয়েক বছর আগে বলেছিলেন যে, তারা কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান বানিয়ে দেবেন। তাদের সেই স্বপ্ন কিন্তু আজ মোটামুটি সফল। লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের গড় পার আজ মুসলমান অধ্যুষিত। হিন্দুরা একে একে বাড়ি বেচে পালিয়েছে। রাজাবাজার, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজের কথা তো ছেড়েই দিতে হবে। আজ কলকাতার এমন কোনো অঞ্চল নেই, যে এলাকার বাসিন্দারা সকালে আজানের চীৎকার না শুনে ঘুম থেকে ওঠেন বা সেই দুর্বোধ্য চীৎকার না শুনে রাতে ঘুমোতে যান। তবু নিজ অস্তিত্ব বাঁচাতে বাঙ্গালি সমাজের কাঙ্ক্ষিত জাগরণ কোনোভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এখনও জেগে ঘুমোচ্ছে বাঙ্গালি। পশ্চিমবঙ্গের ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলও এই ব্যাপারে উদাসীন। প্রশাসন দলদাস। সংবাদমাধ্যম সেকুলার। বুদ্ধিজীবীরা পেটের দায়ে মিনি পাকিস্তানপন্থী মেয়রের দলীয় কর্মী। এ রাজ্যের শিক্ষক সমাজ, শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষক— আন্দোলন করতে ভুলে গিয়েছে। আর কলকাতা পুরোপুরি 'মিনি পাকিস্তান' হতে চলেছে। আজ এমন একটি জায়গার নামোল্লেখ করব, যা শুনলে অনেকেই হয়তো চমকে উঠবেন।

বালিগঞ্জ। নাম শুনলেই মনে হয় সেকুলার, সোশ্যালিস্ট, লিবারেল, আধুনিক ও আধুনিকা বাঙ্গালির বাস। তাই তো? বাস্তব কিন্তু এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে এটি একটি মুসলমানপ্রধান কেন্দ্র। 'চাণক্য'-এর ভোট সমীক্ষা অনুযায়ী, বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ৫১ শতাংশ মুসলমান। বাকি ৪৯ শতাংশের মধ্যেও বাঙ্গালি কম। এর অন্যতম কারণ হলো, স্থানীয় বাঙ্গালিরা গত ৩০-৪০ বছর ধরে না পেয়েছে চাকরি, না পেয়েছে ব্যবসার সুযোগ। চাকরি না পাওয়া এবং ব্যবসার সুযোগ সংকুচিত হওয়ার কারণে এই কেন্দ্রে বাঙ্গালি ভোটার ৪০ শতাংশেরও কম। তাহলে কেন মুসলমানরা এখানে জনপ্রতিনিধি নয়? এই এলাকার সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির বিধায়ক, কাউন্সিলর এখনও পর্যন্ত মুসলমান নয়। কারণ, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে জেহাদিরা এখানে অপেক্ষা করছে। তারা এখনও উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় বঙ্গ দখল করতে পারেনি। যেদিন পারবে, সেদিন বালিগঞ্জে একজন হিন্দুকেও তারা রাখবে না।

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাশ করান একের পর এক আইন। কংগ্রেসি শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া আইনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'দ্য ক্যালকাটা ঠিকা টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৪৯', 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস্ অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩' ও 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস্ অ্যাক্ট, ১৯৫৫'। ভূমি সংস্কারের নামে গ্রাম বাঙ্গলার বাঙ্গালি জমিদারদের জায়গা-জমি যখন কেড়ে নিচ্ছিলেন বিধান রায়, তখন বালিগঞ্জের 'আধুনিক মনোভাবাপন্ন' মানুষরা হাসছিলেন হয়তো। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যায়ে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগ দাবি করে যে, হিন্দু বাঙ্গালি জমিদারদের সব জমি কেড়ে নিতে হবে কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গভূমির দুই-তৃতীয়াংশ দেশভাগের বলি হলেও, তার থেকে কোনো শিক্ষা না নিয়ে স্বাধীনতার পরে মুসলিম লিগের দাবি মেনে নিয়ে হিন্দু বাঙ্গালি জমিদারদের পথে বসানো শুরু করে কংগ্রেস। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'জলসাঘর' ছবিতে এবং তপন সিনহা তাঁর 'হারমোনিয়াম' ছবিতে এই জমিদারদের চরম দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

এরপর বিধান রায় টার্গেট করেন বাঙ্গালি ব্যবসায়ী সমাজকে। সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক, তিলি, কৈবর্ত্য, মাহিষ্য, সদ্‌গোপদের তিনি পথে বসান। সেই সময় বনেদি ব্যবসায়ী পরিবার বলতে ছিল— শীল, গুঁই, লাহা, নস্কর, মণ্ডল, রায়, মল্লিক, কুণ্ডু, শেঠ ও বসাক পরিবার। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা জেহাদি সন্ত্রাসে সর্বস্ব হারিয়ে এদেশে আসতেই নিজের সরকারের খরচ বাঁচাতে এই ব্যবসায়ী পরিবারগুলির ভূসম্পত্তি দখল করে সেখানে এই উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। উত্তর কলকাতা শহরতলি এলাকা দমদমে শীল, রায়, মল্লিক, শেঠ ও কুণ্ডুদের জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার পিছনে বিধান রায়ের উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে রাজ্য সরকারের খরচ কমানো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন এই ব্যয় সংকোচের এই রাস্তা নেয়, তখন হয়তো প্রাণের সুখে হাসছিল বালিগঞ্জ, যাদবপুর, টালিগঞ্জের সোশ্যালিস্ট, সেকুলার বাঙ্গালি।

এরপর শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিকে শেষ করে দেওয়ার পালা। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকারের টার্গেট ছিল গ্রামাঞ্চলের মাহিষ্য, কৈবর্ত্য, উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি), কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমাজ। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসুরা ভূমি সংস্কারের নামে হিন্দুদের জমি যখন মুসলমানদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, তখন অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই বর্বরসুলভ কাজকে অর্থনীতির মডেল বানিয়ে বিক্রি করছিলেন সারা পৃথিবীতে। কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর— রাজ্য সরকারের বিধ্বংসী নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের ভূমিপুত্ররা হয় প্রবলভাবে আক্রান্ত। বামফ্রন্ট আমলে যখন রাজ্যের শিল্পের ওপর আঘাত শুরু হয় এবং চর্মনগরী বাদে রাজ্যের অধিকাংশ ছোটো-বড়ো- মাঝারি শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়, তখন এ রাজ্যের শহরাঞ্চল ও মফঃস্বলের বাঙ্গালিরা নিজের ছেলে-মেয়েদের ব্যাঙ্গালোর, ভাগ্যনগর, মুম্বই, পুনে, দিল্লি, নয়ডা, গুরুগ্রাম ও আমেরিকা পাঠানো শুরু করে। বালিগঞ্জ মুসলমান-অধ্যুষিত হয়ে ওঠার অর্থ হলো— দ্বিতীয়বার বাঙ্গালিকে ভিটেমাটি ছাড়ার সংকেত দিচ্ছে পরিবেশ-পরিস্থিতি। ১৯৪৭-এর পর বাঙ্গালিকে ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। আগামীদিনে কলকাতা থেকেও হয়তো চিরতরে হাত গোটাতে হতে পারে বাঙ্গালিকে। বাঙ্গালিকে ভাবতে হবে যে, জিন্নার সেই কলকাতা দখলের স্বপ্নকে সফল করতে তারা ঘুমিয়েই থাকবে, নাকি শ্রীঅরবিন্দ, পুলিনবিহারী দাশ, হেমচন্দ্র কানুনগো, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পথে এগিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে তারা বাঁচাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এবং কলকাতার বুকে ধরে রাখবে নিজেদের অস্তিত্ব। □

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার খেলায় বলি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গত ১৫ মার্চ ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার সঙ্গেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক পরিবর্তন হবে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ক্ষমতা বজায় রাখার এক গভীর ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আবর্তে বন্দি। ধর্মতলার রাজপথ থেকে শুরু করে পাড়ার বুথ স্তর, সর্বত্রই চলছে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক ষড়যন্ত্র। এখন সময় এসেছে সেই ধোঁয়াশা পরিষ্কার করার।

প্রথমে আসা যাক ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে। বিগত কিছুদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরাজ্যের বাসিন্দাকে অনেক 'বিচারাধীন'-এর জটিল জালে ফেলে আটকে রাখা হচ্ছে। কেন এই অদ্ভুত কর্মকাণ্ড? প্রবুদ্ধ সমাজ বলছে, এর নেপথ্যে কাজ করছে এক সুচতুর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তৃণমূল খুব ভালো করেই জানে যে তাদের 'পকেট ভোটার' কারা। যাদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে, এই স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের নাম কাটা পড়ার কথা। তাই নিজেদের ভোটব্যাংক বাঁচাতে তারা এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে।

অভিযোগ উঠছে, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা শাসকদলের অনুগত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) কর্মীরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছেন। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা গেঁথে দেওয়া হচ্ছে যে, এই নতুন প্রক্রিয়া মানেই হয়রানি। মনে পড়ছে বিমুদ্রীকরণের সেই দিনগুলির কথা। তখন বামপন্থী ব্যাংক কর্মীরা কাউন্টারে ইচ্ছা করে ধীরগতিতে কাজ করতেন যাতে রোদে দাঁড়ানো মানুষের রাগ সরাসরি সরকারের ওপর গিয়ে পড়ে এবং মিডিয়াতে একটি আলোড়ন তৈরি করা যেতে পারে যে মানুষের কত সমস্যা হচ্ছে। আজ এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই 'স্লো-ডাউন' পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। যেকোনো ভাবেই হোক না কেন এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে স্লো ডাউন করা বা পুরোপুরি অব্যবস্থিত করে দেওয়া; যাতে প্রক্রিয়াটা ঠিক ভাবে পূর্ণ না হতে পারে। এতে আসলে সেই সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দুশ্চিন্তা বাড়লো যারা স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক। মানুষের এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা তৃণমূল করছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত সরকারি কর্মচারীরা প্রকাশ্যে রাজনীতি করেছেন এবং কৌশলে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দিয়ে এক বিশৃঙ্খলা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়া এবং অসাংবিধানিক উপায়ে এই সংস্কার প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সক্রিয় ও সজাগ রয়েছে, তাই প্রকৃত ভোটারদের কোনো নাম বাদ যাবে না এই বিশ্বাস মানুষ রেখেছে।

অন্যদিকে, হঠাৎ করে ধর্মতলার রাজপথ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা উঠে যাওয়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ হঠাৎ খালি হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অনেক চর্চা। সরকারিভাবে অনেক কারণ দেখানো হলেও আসল সত্যিটা লুকিয়ে আছে ধর্মতলার অলিগলিতে। কিন্তু ধরনা তোলার আসল কারণ কিন্তু জনস্বার্থ একদমই নয়।

আসল সত্যিটা লুকিয়ে আছে ধর্মতলার চত্বরে জারি হওয়া ১৪৪ ধারার মধ্যে। এই কড়াকড়ির ফলে ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত এবং ইদের বিপণন কার্যত থমকে গিয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, শাসকদলের পরম প্রিয় এবং তথাকথিত 'দুধেল গাই' ভোটব্যাংকের ব্যবসায়ীরা এই ধরনার জেরে চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন। বিশেষ সম্প্রদায়ের এই ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল যে, ধরনার জন্য তাদের খদ্দের আসতে পারছে না। নিজের ভোটব্যাংকের স্বার্থে আঘাত লাগলে যে গদি টলে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায় রাতারাতি ধরনা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ বুঝতে পারছেন, একদিকে প্রকৃত ভোটারদের অধিকার হরণ করে ভীতি প্রদর্শন, আর অন্যদিকে ভোটের স্বার্থ রক্ষায় আন্দোলনের ভোলবদল— তৃণমূলের এই দ্বিচারিতা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ক্ষমতার এই খেলায় সাধারণ মানুষের আবেগ নিয়ে আর কতদিন খেলবে এই সরকার? আগামী নির্বাচন তারই উপযুক্ত জবাব দেওয়ার একটি সাংবিধানিক পথ।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬৭)

প্রথম সাক্ষাৎ

বন্ধু শ্রীবাবারাও সাভারকরের বিশেষ আহ্বানে ডাক্তারজী ১৯৩১ সালের ১১ মার্চ কাশী গিয়েছিলেন। বিশ-বাইশ দিন তিনি সেখান থেকে নিত্য সম্পর্ক তৈরির মধ্যে দুটি শাখা শুরু করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর অনুমতি নিয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও শুরু হয় শাখা। এখানে শাখার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও প্রেরণাব্যঞ্জক। ডাক্তারজী ফিরে এলে স্বয়ংসেবকদের পত্রের মাধ্যমে শাখার গতি প্রকৃতি বিস্তার সম্পর্কে সব জানতে পারতেন। সবচেয়ে খুশি হলেন শুনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ অধ্যাপকও সঙ্ঘকার্যে আগ্রহী হয়েছেন। স্বয়ংসেবকদের পত্রেই তিনি অধ্যাপনায় যুক্ত এবং সঙ্ঘ অনুরাগী শ্রীমাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরের নাম ও তাঁর সামগ্রিক বিষয়ে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে বোধ হয় গরমের ছুটি ছিল। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীগুরুজী নাগপুর বাড়িতে এসেছেন। একদিন নাগপুরে রাস্তা দিয়ে তিনি যাবার সময় ডাক্তারজীও সেই পথে আসছিলেন, হঠাৎ ডাক্তারজী থমকে দাঁড়িয়ে গুরুজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'আপনি শ্রীমাধবরাও গোলওয়ালকর না?' স্বয়ংসেবকদের কাছে যে বর্ণনা শুনেছিলেন তার ভিত্তিতেই এই অনুমান। শ্রীগুরুজীর কাছে 'হ্যাঁ' উত্তর শুনে অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে ডাক্তারজী বললেন— 'আপনার সুবিধা মতো একদিন আমার বাড়িতে এলে খুব ভালো হয়'। শ্রীগুরুজী গিয়েছিলেন ডাক্তারজীর বাড়ি। পূজনীয় ডাক্তারজীর সঙ্গে পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজীর ছিল এটি প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীগুরুজীর পক্ষে এই সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটিকে যদি তখন কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের নিরিখে বিচার করা যেত, তবে নিশ্চয়ই দেখা যেত সেই ক্ষণটি ছিল ইতিহাসের এক স্বর্ণিম যুগ পরিবর্তনের শুভমুহূর্ত। যেন কৃষ্ণার্জুনের প্রথম পরিচয়।

এবার শ্রীগুরুজীর মুখে একটু ডাক্তারজীর কথা শোনা যাক— 'আমার উপর সঙ্ঘের সংস্কার যে কবে হলো বুঝতেও পারেনি। আমি খুব আড্ডাবাজ ছিলাম। পাঠশালায় নিয়ম-কানুন ঠিকমতো মেনে চলতে পারতাম না। তবে পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। পরীক্ষার আগে কিছু সময় নিয়মিত পড়াশোনা করে ভালো মতোই পাশ করে যেতাম। কলেজের পড়াশোনাও এভাবে হয়েছিল। তাহলে সঙ্ঘের সংস্কার আমার উপর কীভাবে হলো? সে কথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আর জানেন ডাক্তার হেডগেওয়ার।'

'...একবার ভুলবশত ডাক্তারজীর বক্তৃতা শুনেছিলাম। নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর আমার খুব অহঙ্কার ছিল। কিন্তু ডাক্তারজীর বক্তৃতায় ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আলোচনা, বিভিন্ন সিদ্ধান্তের খণ্ডন কিছুই ছিল না। ডাক্তারজী বললেন— 'স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্ঘকার্য করে যাও'। একেবারে সাদাসিধে বক্তৃতা— সেই বক্তৃতায় কোনো বিদ্যাবৃত্তির ছাপ ছিল না, কিন্তু ওই বক্তৃতায় যে স্নেহার্দ্রতা ছিল কোনো শুষ্ক হৃদয় কেমন করে বুঝবে? বিদ্যাবৃত্তির কঠিন আবরণে আমার চারিদিক ঢাকা ছিল। আদর্শ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে ওই বক্তৃতায় যে ব্যাকুলতা ছিল, তা আমার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন থাকার পরে আমার জীবনের নিশ্চিত দিশা প্রাপ্ত হয়েছিল। বহু সময় একসঙ্গে থাকার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আদর্শ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কথা হয়নি, তবু আমার অহংকার গলে জল হয়ে গিয়েছিল। মনে পরিবর্তন এসেছে, আমার উপর সংস্কার হয়েছে। ডাক্তারজী আমার অভিমান-বোধটাকেই ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বিদ্যাবত্তা তাঁর সামনে টিকতে পারেনি।' অদ্ভুত, অভূতপূর্ব এই কথা শোনার পর এই দুই যুগপুরুষের চিত্র সম্মুখে আত্মমগ্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো কর্তব্য থাকে না।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস